আপনার খাদ্য ও আপনি
আপনার খাদ্য ও আপনি
আপনার খাদ্য ও আপনি

আপনার খাদ্য ও আপনি

কোঙ্গদ্র তম্মু অচ্চয়া

আপনার খাদ্য ও আপনি
আপনার খাদ্য ও আপনি
আপনার খাদ্য ও আপনি

ভারতবর্ষ—দেশ ও দেশবাসী

আপনার খাদ্য ও আপনি

আপনার খাদ্য ও আপনি

কোঙ্গড্র তম্মু অচ্চয়া

অনুবাদ

প্রণতি চ্যাটার্জি

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

1976 (*Saka* 1898)
Reprinted 1983 (*Saka* 1905)
Reprinted 1986 (*Saka* 1907)

Rs. 7.00

APNAR KHADYA O APNI (*Bengali*)

Published by the Director, National Book Trust, India, A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed at Saraswati Art Printers, 8247/2 New Anaj Mandi, Delhi-110006

ভূমিকা

এই বইটিতে নতুন কথা অল্পই আছে। এখানে ভারতীয় পুষ্টি-বিজ্ঞানীদের অভিমত তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায় সাধারণ পাঠকের বইটি ভালো লাগবে এবং তাঁরা এর বিষয়বস্তুর মূল্য বুঝতে পারবেন।

বইটি লিখতে তিনটি বইয়ের বিশেষ সাহায্য নিতে হয়েছে। একটি হল, "নিউট্রিটিভ ভ্যালু অব ইণ্ডিয়ান ফুড", লেখক সর্বশ্রী সি. গোপালন, বি. ভি রামাশাস্ত্রী এবং এস. সি. বালাসুব্রামানিয়ন (ন্যাশনাল ইনস্টিটুট অব নিউট্রিশন, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, 500007, 1971)। আরেকটি হল, "হিউম্যান নিউট্রিশন: প্রিনসিপল্‌স অ্যাণ্ড অ্যাপ্লিকেশন ইন ইণ্ডিয়া" লেখক ম্যাক্সাইন ই ম্যাকডিভিট ও সুমতি আর মুদাম্বী (প্রেনটিস-হল অব প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি 1973), তৃতীয় বই "অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন" লেখিকা আর. রাজলক্ষ্মী (বায়োকোমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট, এম. এস. য়ুনিভার্সিটি অব বরোদা, বরোদা 1969)। হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় পাক্ষিক পত্রিকা "নিউটিশন"-এর কয়েকটি সংখ্যার মূল্যবান সাহায্যও নেওয়া হয়েছে।

ডাঃ কে. টি. আচায়া

সূচী

তালিকা-সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

খাদ্যবস্তুর উপাদান

আমরা দিনে কয়েকবার আহার করি। তাই খাদ্যবস্তুর উপাদান এবং আহারের পর খাদ্যের কি পরিণাম হয় তা জানা খুবই দরকার। খাদ্যবস্তুর উপাদানগুলি কি প্রয়োজনে লাগে এবং পূর্ণমাত্রায় তা না পেলে কি কুফল হয় তাও আমাদের জানা উচিত। এ সমস্ত বিষয় জানা থাকলে আমরা ভালো ভাবে খাদ্য বেছে নিতে পারবো।

মনে রাখতে হবে আমাদের ভারতীয় খাদ্য মোটেই নিকৃষ্ট নয়। পুষ্টির দিক থেকে বিচার করলেও মোটামুটি আমাদের শরীরের পক্ষে যা যা দরকার ভারতীয় খাদ্যে তার সবই পাওয়া যায়। ভারতীয় খাদ্য বলতে সাধারণত রুটি, ভাত, নানাপ্রকারের ডাল এবং ভাজা ও সাঁতলানো তরকারি বোঝায়। এর সঙ্গে যদি কিছুটা দুধ, দই, টাটকা শাকপাতা, কাঁচা সজী আর ফল যোগ করি তা হলেই আমরা মোটামুটি সুষম-খাদ্য পাব।

খাদ্যের পৌষ্টিক উপাদান

আমাদের খাদ্যে কতকগুলি পুষ্টিকর উপাদান থাকে যাকে পৌষ্টিক উপাদান বলা হয়। এই সব পৌষ্টিক উপাদানগুলিকে পাঁচটি মুখ্য ভাগে

ভাগ করা হয়, যেমন শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট), আমিষ (প্রোটিন), স্নেহপদার্থ (ফ্যাট), খাদ্যপ্রাণ (ভাইটামিন) এবং খনিজপদার্থ (মিনারেল)। কয়েক প্রকার খাদ্যে এক-একটি পৌষ্টিক উপাদান বেশি থাকে, যেমন ভাতে শ্বেতসার, ডালে প্রোটিন ও রান্নার তেলে স্নেহপদার্থ বেশি পরিমাণে থাকে। কিন্তু দুধ প্রভৃতি কয়েক-প্রকার খাদ্যে অনেকগুলি পৌষ্টিক উপাদান একসঙ্গে পাওয়া যায়। পৌষ্টিক উপাদান বলতে ঠিক কি বোঝায়? শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থ— শরীরের জন্য প্রচুর পরিমাণে দরকার, কারণ এরা শরীর চালনার শক্তির উৎস। খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থ অল্প মাত্রায় হলেও কাজ চলে। এই উপাদানগুলি শরীর চালনায় শক্তি যোগায় না বটে কিন্তু নানাপ্রকার শারীরিক প্রক্রিয়া সহজ ও সুচারুরূপে পরিচালনার কাজে বিশেষ প্রয়োজনে লাগে।

শক্তি

খাদ্যই আমাদের শক্তির প্রধান উৎস। মোটর গাড়ি চালাবার জন্য যেমন পেট্রলের দরকার, তেমনি শরীর-চালনার শক্তির জন্য দরকার খাদ্যের। এমন কি একথা বললেও ভুল বলা হয় না যে আমাদের শরীর খাদ্যকে জ্বালিয়ে তার থেকে শক্তি উৎপন্ন করে। যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখনও আমাদের শরীরের কোনো-কোনো যন্ত্র কাজ করে চলে, যেমন হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়, ফুসফুস শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় এবং পরিপাক-ক্রিয়াও চলতে থাকে। এই সকল কারণে সর্বদাই খানিকটা মূল শক্তির একান্ত আবশ্যক। এ ছাড়াও দৈহিক ও মানসিক কাজ করবার জন্য আমাদের শক্তির প্রয়োজন। শারীরিক শ্রম যত বেশি কঠোর হবে তত বেশি শক্তিও ব্যয় হয়, সেই অনুপাতে অধিক পরিমাণ খাদ্যও দরকার।

এই শক্তিকে আমরা কিভাবে মাপি? যেমন মিটার হিসাবে কাপড়, ঘণ্টা ও মিনিট হিসাবে সময় মাপি, শারীরিক শক্তি সেই রকম কিলো-ক্যালরি হিসাবে মাপা হয়। সাধারণত কিলোক্যালরিকে সংক্ষেপে

ক্যালরি বলে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় প্রায় 1500 ক্যালরি মূল শক্তির প্রয়োজন। সাধারণ কায়িক পরিশ্রমের জন্য আরও 1100 থেকে 1300 ক্যালরি লাগে। তা হলে একজন সুস্থ স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক মানুষের 2600 থেকে 2800 ক্যালরি শক্তি চাই। স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা আকারে ছোট বলে তাদের শক্তির প্রয়োজন সেই অনুপাতে কম। তবে তাদের গর্ভাবস্থায় এবং শিশুকে স্তন্যদানকালে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্যালরির চাহিদা হয়। শিশুদের ক্যালরির প্রয়োজন তাদের বয়স এবং শারীরিক গঠনের উপর নির্ভর করে।

আমরা দেখেছি শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ শরীরে শক্তি যোগায়। এখন দেখা যাক এই সব পৌষ্টিক উপাদান বলতে কি বোঝায়?

শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট)

পৃথিবীর সব দেশের খাদ্যেই সাধারণত শ্বেতসারযুক্ত খাদ্যই শক্তির উৎস। শস্যখাদ্য যথা গম, চাল, বাজরা, জোয়ার ও রাগীতে প্রচুর শ্বেতসার, সুপাচ্য মণ্ড-শর্করা (স্টার্চ) রূপে পাওয়া যায়। শ্বেতসার-যুক্ত খাদ্য আলু এবং কলাতেও এই শর্করা থাকে। এই সকল খাদ্যে দুষ্পাচ্য শর্করা, জল প্রভৃতি নানাপ্রকার অন্য উপাদানও পাওয়া যায়। অন্য দিকে চিনি ও গুড়ে শুধু শুদ্ধ ঘনীভূত শ্বেতসার থাকে। এই শ্বেত-সার সুপাচ্য এবং শরীরকে খুব তাড়াতাড়ি শক্তি যোগায়। শস্যখাদ্য (সিরিয়াল) এবং চিনি শক্তিদায়ক খাদ্য এবং অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে পাওয়া যায় বলে আমরা এই সব খাদ্য পরিমাণে বেশি খাই। আমাদের খাদ্যের অধিকাংশই এই সব খাদ্যদ্রব্য পূরণ করে ও সে কারণে এই সব খাদ্যদ্রব্য আহারে পরিতৃপ্ত হই। স্বভাবতই আমাদের খাদ্যতালিকায় এদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আমাদের শরীরে 4 ক্যালরি

শক্তি উৎপাদন করতে মাত্র এক গ্রাম শ্বেতসারই যথেষ্ট।

সব্জীতে কি শ্বেতসার পাওয়া যায়? কিছু সব্জীতে শ্বেতসার থাকে। সাধারণত সব্জীতে একপ্রকার শক্ত আঁশজাতীয় শ্বেতসার থাকে যা মানুষ হজম করতে পারে না, কিন্তু পশুরা পারে। শাকসব্জীর আঁশ দিয়েই ছিবড়া তৈরি হয়। খাদ্যনালীর ভিতর দিয়ে খাদ্য যাবার সময় অল্পপরিমাণে এই ছিবড়ার সাহায্য দরকার হয়। এই ছিবড়া ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন সব্জী আমাদের খাদ্যে নানা প্রকারের স্বাদগন্ধ এনে দেয়! এছাড়া সব্জী থেকে আমরা খাদ্যপ্রাণ ও খনিজশ্রেণীর পৌষ্টিক উপাদান পাই।

প্রোটিন

তিনটি মুখ্য পৌষ্টিক উপাদানের মধ্যে প্রোটিনের স্থান শ্বেতসারের পরেই। প্রোটিন একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় পৌষ্টিক উপাদান। আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষে—পেশী, হাড়, রক্ত, মগজ, চামড়া ও চুলে প্রোটিন আছে। একটি বাড়ি তৈরি করতে যেমন ইটের গাঁথুনির দরকার তেমনি আমাদের শরীর গড়ে ওঠে প্রোটিনের সাহায্যে। যখন শরীরের কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখন প্রোটিনই সেই ক্ষয়ক্ষতি-পুরণের ও মেরামতের কাজ করে। এ ছাড়া বহু শারীরিক প্রক্রিয়াতেই প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে প্রোটিনের সাহায্য ছাড়া সেইসব শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি বন্ধ হয়ে যাবে ও হয়তো প্রাণহানি ঘটারও সম্ভাবনা থাকে।

শ্বেতসারের মতো প্রোটিন আমাদের শরীরের শক্তির উৎস। যথার্থ ই শ্বেতসারের মতন এক গ্রাম প্রোটিন থেকে আমরা 4 ক্যালরি শক্তি পাই। কিন্তু প্রোটিন থেকে ক্যালরির মতো শক্তি গ্রহণ করা প্রোটিনের অপচয় মাত্র। বরং শরীরের শক্তির জন্য যতটা দরকার ততখানি শ্বেতসারযুক্ত খাদ্যগ্রহণ করে অত্যাবশ্যক শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি চালনার

জন্য প্রোটিন বাঁচান ভালো! কারণ প্রোটিনের সাহায্য ছাড়া সেগুলি কাজ করতে পারে না।

আমাদের খাদ্যে, শুধু প্রোটিনের পরিমাণ নয় প্রোটিনের প্রকৃতি অর্থাৎ প্রোটিন উৎকৃষ্ট কিনা সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জৈব প্রোটিন যথা মাংস, মাছ, ডিম ও দুধ থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায়। ডিম থেকে যে প্রোটিন আমরা পাই তাকে পুষ্টির দিক থেকে 90 নম্বর দেওয়া হয়, আর মাংস ও দুধ থেকে যে প্রোটিন পাই তাকে দেওয়া হয় 70 নম্বর। কিন্তু সব্জী থেকে যে প্রোটিন পাই তাকে অনেক কম নম্বর দেওয়া হয়। ডাল ও ছোলার প্রোটিনের নম্বর 50-55, গমের প্রোটিনের নম্বর সে তুলনায় 45। কখনও কখনও ঠিক ভাবে দুটি প্রোটিন-যুক্ত খাদ্য মেশাতে পারলে যে প্রোটিন পাওয়া যাবে তার নম্বর একটি প্রোটিন-যুক্ত খাদ্যের প্রোটিনের নম্বরের অনেক বেশি হবে। আমরা যখন গমের রুটি ও ডাল একসঙ্গে খাই তখন আমাদের এ-দুটি খাদ্য থেকে সংগৃহীত প্রোটিনের নম্বর যোগ হয়ে বেড়ে যায়। রুটি ও ডালের সঙ্গে যদি একটু দুধ বা দই খাওয়া যায় তা হলে মিশ্রিত প্রোটিনের নম্বর ও গুণ আরও বেড়ে এই তিনটি প্রোটিনের যোগফলকে ছাড়িয়ে যাবে।

মাংস, মাছ, ডিম ও দুধ থেকে আমরা জৈব প্রোটিন পাই। ভারতীয় খাদ্যে প্রোটিনের একটি বড় উৎস হল বিভিন্ন প্রকারের ডাল ও ছোলা; তার মধ্যে কয়েকটি হল—কলাই এবং মুগ প্রভৃতি। প্রোটিনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল বিভিন্ন প্রকারের বাদাম ও তৈল-বীজ। যেমন – চিনাবাদাম, কাজুবাদাম, শক্ত খোসাওলা বাদাম, নারকোল এবং তিল ইত্যাদি। চাল, গম ও অন্যান্য শস্যখাদ্যকে সাধারণত অধিক প্রোটিন-যুক্ত খাদ্যহিসাবে ধরা হয় না, কারণ এতে মাত্র শতকরা 6 থেকে 9 ভাগ প্রোটিন থাকে। কিন্তু আমরা প্রত্যহ অধিক পরিমাণে ভাত ও রুটি খাই বলে তা থেকেও বেশ কিছুটা

প্রোটিন পাই। অধিকাংশ ভারতীয়ই ভাত, রুটি এবং ডাল থেকে প্রয়োজনীয় প্রোটিন পান।

স্নেহজাত পদার্থ এবং তৈল

আমাদের খাদ্যের তিনটি মুখ্য উপাদানের মধ্যে তৃতীয় স্থান হল স্নেহজাত পদার্থের। উদ্ভিজ্জ রান্নার তেল, বনস্পতি অথবা ঘি থেকে আমরা স্নেহজাত পদার্থ পাই। চিনি যেমন শ্বেতসার ছাড়া আর কিছুই নয়, তেমনি তেল ও ঘি শুধুই স্নেহজাত পদার্থ। দুধ বা পূর্বোক্ত তালিকায় যে সব বাদাম ও তৈলবীজের উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকেও আমরা কিছুটা স্নেহপদার্থ পাই। কারণ এই সব খাদ্যে প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ দুটিতে পৌষ্টিক উপাদানই আছে। আমাদের শরীর স্নেহজাত পদার্থকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে তা থেকে শক্তি গ্রহণ করে। শ্বেতসার বা প্রোটিনের অপেক্ষা অধিক শক্তির উৎস হল স্নেহজাত পদার্থ। যেখানে এক গ্রাম শ্বেতসার বা প্রোটিন থেকে আমরা 4 ক্যালরি শক্তি পাই সেখানে এক গ্রাম স্নেহজাত পদার্থ থেকে শক্তি পাওয়া যায় 9 ক্যালরি। স্নেহজাত পদার্থ হল শক্তির ঘনীভূত আকার। আমাদের আহারে স্নেহজাত খাদ্য যুক্ত হলে খাদ্যের পরিমাণ না বাড়ালেও ক্যালরির মান বৃদ্ধি পায়।

ঘি ও বনস্পতি হল জমাট স্নেহজাত খাদ্য, চিনাবাদামের তেল, তিল-তেল, নারকোল ও সরষের তেল হল তরল স্নেহজাত খাদ্য। এই সব স্নেহজাত খাদ্য থেকেই আমরা সমপরিমাণ ক্যালরি পাই। তাদের পার্থক্য শুধু গন্ধে এবং বিভিন্ন প্রদেশের লোকেদের স্বাদে; যেমন কেরল প্রদেশে রান্নায় নারকোল তেল ও বাঙলা দেশে সরষের তেল ব্যবহার করে। বনস্পতি, ঘি এবং বিভিন্ন প্রকার তেল থেকে একই পরিমাণ ক্যালরি পাওয়া গেলেও পৌষ্টিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে কয়েক প্রকার তেল ব্যবহারের দিকে ঝোঁক বেড়েছে। তেলের মধ্যে আবার

কারডির তেল, সূর্যমুখীর তেল (নতুন চালু হয়েছে), তিল, তুলাবীজ ও চিমাবাদামের তেল ব্যবহার করবার ঝোঁকই বেশি। এই তেলগুলিতে খুব বেশি পরিমাণে পলিঅ্যানস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে যাকে সংক্ষেপে 'পিউফা' (PUFA) বলে উল্লেখ করা হয়। খুব গাঢ় তেল যেমন নারকোল তেল বা সরষের তেল অথবা জমাটবাঁধা ঘি এবং বনস্পতিতে 'পিউফা' (PUFA) উপাদান খুব কম পরিমাণে আছে। আধুনিক গবেষণার ফল দেখে জানা যায় যে জমাট স্নেহপদার্থ বেশি পরিমাণে আহার করলে আমাদের শরীরে 'অ্যাথেরোস্ক্লিরসিস' (ATHEROSCLEROSIS) উপসর্গ দেখা দেবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। আধুনিক যুগের এই সমস্যাসঙ্কুল জীবনযাত্রায় বেশি মাত্রায় জমাট স্নেহপদার্থ ব্যবহার না করাই ভাল। এই উপসর্গে রক্তবাহী শিরাগুলিতে একটি আস্তরণ জমে ও রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটায় যার ফলে হৃৎপিণ্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত পৌঁছায় না, পরিণামে হৃৎপিণ্ডের পেশীর কার্যক্ষমতা নষ্ট হবার সম্ভাবনা খুব বেড়ে যায়। 'পিউফা' যাতে বেশি পরিমাণে আছে সেই সব তেল, যাদের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যবহার করলে এই উপসর্গ কমাবার সহায়তা করে।

খাদ্যপ্রাণ

আমাদের অনেকের এই ধারণা যে সব অসুখেই খাদ্যপ্রাণ যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে। এ কথা সত্য যে খুব অল্প পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ অপুষ্টি-জনিত রোগে মন্ত্রের মতো কাজ করে কিন্তু এ-কথা সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে খাটে না। অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়াগুলির সঠিক পরিচালনায় খাদ্য-প্রাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

কিছু খাদ্যপ্রাণের নাম ইংরেজি বর্ণমালার বর্ণানুসারে রাখা হয়েছে, যেমন খাদ্যপ্রাণ 'এ', খাদ্যপ্রাণ 'বি' (এটি আবার কয়েকটি উপাদানে

তৈরি), খাদ্যপ্রাণ 'সি' এবং খাদ্যপ্রাণ 'ডি'। বর্ণমালা অনুসারে নামকরণ হওয়ায় শুধু এই বোঝায় যে আগে কোন খাদ্যপ্রাণটি আবিষ্কৃত হয়েছে। সবশুদ্ধ প্রায় 12 রকমের খাদ্যপ্রাণ আছে।

খাদ্যপ্রাণ 'এ' আমাদের দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করে। যখন আমরা কিছু দেখি তখন দুটি প্রক্রিয়া কাজ করে, একটি শারীরিক (যখন চোখের লেন্সের সাহায্যে আমরা দেখি), অন্যটি একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা খাদ্যপ্রাণ 'এ' না হলে চলে না। খাদ্যপ্রাণ 'এ'র অভাবে আমরা ভাল দেখতে পাই না বিশেষ করে অল্প আলোতে। যদি ছোট শিশুদের খাদ্যপ্রাণ 'এ'র অভাব হয় তবে তাদের দৃষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের বহু লোক এই পুষ্টির অভাবে তাদের দৃষ্টিশক্তি হারান। ঘি, দুধ, দই, ডিমের কুসুম এবং পশুর মেটুলি থেকে আমরা খাদ্যপ্রাণ 'এ' পাই। এগুলি জৈব উৎস। অনেক সব্জী ও ফলে হলুদ রংয়ের পীত-পোষ্টাই বা ক্যারোটিন নামে একটি পদার্থ থাকে। ক্যারোটিন নামটি গাজরের ইংরেজি নাম 'ক্যারোট' থেকে নেওয়া, কারণ গাজরে বেশি পীত-পোষ্টাই পাওয়া যায়। আমরা পীত-পোষ্টাই-যুক্ত সব্জী ও ফল খেলে আমাদের শরীর পীত-পোষ্টাইকে খাদ্যপ্রাণ 'এ'তে পরিবর্তিত করে। এ কারণে আমাদের পীত-পোষ্টাই-যুক্ত সব্জী ও ফল খাওয়া খুবই প্রয়োজন। সব্জীর মধ্যে পালং ও অন্যান্য শাক, যেমন ধনে, পুদিনা ও কাঁচা কুমড়া এবং ফলের মধ্যে পেঁপে, আম ও টমেটো হল পীত-পোষ্টাই-যুক্ত খাদ্য।

খাদ্যপ্রাণ 'বি' হল কয়েক-প্রকার খাদ্যপ্রাণের একটি সমষ্টি। এদের যথাক্রমে বি$_1$, বি$_2$, বি$_6$ ও বি$_{12}$ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। আবার কয়েকক্ষেত্রে যেমন বি$_1$-এর বদলে থায়ামিন, 'বি$_2$'-এর বদলে 'রিবোফ্লোভিন' এবং বি$_6$-এর বদলে 'পাইরিডক্সিন' এই সব নাম ব্যবহৃত হয়। নিয়াসিন, ফলিক অ্যাসিড, বায়োটিন এবং প্যাণ্টোথিনিক অ্যাসিড এবং খাদ্যপ্রাণ বি$_{12}$ এদের অন্য কোন নাম নেই। এই সমষ্টির প্রত্যেকটি

খাদ্যপ্রাণ আমাদের শরীররক্ষার জন্যে তাদের নির্ধারিত কাজে লাগে। এই সব খাদ্যপ্রাণ স্নায়ুতন্ত্র, চুলপড়া, জিভের ঘা রোধ, চামড়ার মসৃণতা, রক্তে লালকণিকা, ঠিকমতো ভাবে দেহকোষ বৃদ্ধি ইত্যাদি অত্যাবশ্যক বিষয়ে সহায়তা করে। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদান-কালে স্ত্রীলোকের ফলিক অ্যাসিড ও খাদ্যপ্রাণ বি$_{12}$-এর বিশেষ প্রয়োজন হয়, কারণ এই দুটি রক্তশূন্যতা নিবারণ করে। ডাল, দুধ এবং দুগ্ধজাত সকল খাদ্য, ডিম সব্জী, বাদাম ও মাংসেতে এই 'বি'-সমষ্টির খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়।

অম্লস্বাদযুক্ত খাদ্যপ্রাণ 'সি', গোঁড়ালেবু, পাতিলেবু, কমলালেবু, আমলকী, কল-বেরুনো ছোলা, বাঁধাকপি, পেয়ারা, কুল, জাম ও ফলসাতে (এতে পীত-পোষ্টাইও আছে) পাওয়া যায়। এই খাদ্যপ্রাণ আমাদের সর্দি প্রভৃতির ছোঁয়াচলাগা থেকে রক্ষা করে ও দাঁত ও হাড় শক্ত করে।

আর একটি খাদ্যপ্রাণ 'ডি' হাড়গঠনে এবং ক্যালসিয়ামকে ঠিক মতো হাড়ে পৌঁছানোর কাজে সহায়তা করে। মাখন, ঘি এবং হাঙ্গরের যকৃৎ থেকে তৈরি তেলে এই খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়। রোদপোহালে আমাদের শরীরে এক অভিনব উপায়ে এই খাদ্যপ্রাণ তৈরি হয়। খোলা রোদে খেলা করা, বিনা খরচায় এই খাদ্যপ্রাণ লাভ করার এক সহজ উপায়। পর্দানশীন নারী যারা ঘরে আবদ্ধ থাকে এবং যারা রোদের থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ দেহ ঢেকে রাখে তারা প্রকৃতির এই দান হেলায় হারায়।

লবণ ও খনিজ জাতীয় পৌষ্টিক উপাদান

পৌষ্টিক উপাদানগুলির মধ্যে সর্বশেষে আলোচনা করা যাক লবণ-জাতীয় উপাদান সম্বন্ধে। রান্নায় নুন অথবা সোডিয়াম ক্লোরাইড হল শরীররক্ষার একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পৌষ্টিক উপাদান। অন্যান্য উপাদানের মত শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে নুন সাহায্য করে।

দুধ, মাছ ও ডাল থেকে আমরা আমাদের হাড় ও দাঁতের সাদা ধাতবপদার্থ ক্যালসিয়াম পাই। শস্যখাদ্যের মধ্যে রাগীতে খুব বেশি মাত্রায় ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়।

'লাল' খনিজপদার্থ লোহা পেশী ও রক্তের লালকণিকা গড়বার কাজে সহায়তা করে। টাটকা শাক, রাগী, বাজরা, মাংস এবং ডিমে লোহা পাওয়া যায়। মেথিতে, বিশেষ করে কল-বেরুনোর পর লোহা বেশি পরিমাণে থাকে। কিস্‌মিস্‌ ও খেজুরে এই পৌষ্টিক উপাদান অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়।

খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পৌষ্টিক উপাদান আমরা ফল, কাঁচা সব্জী ও টাটকা শাকসব্জী থেকে সংগ্রহ করি। ভারতীয় খাদ্যে এগুলি প্রায়ই থাকে না। এই তালিকার কয়েকটি খাদ্য যদি আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যের সঙ্গে যুক্ত করি তা হলে পুষ্টিবিচারে আমাদের খাদ্যের মান অনেক বেড়ে যাবে। প্রতিদিন সুষমখাদ্য আহার করলে, দামী টনিক বা কোন বিশেষ খাদ্যের প্রয়োজন হবে না।

তালিকা 1.1-এ খাদ্যে পৌষ্টিক উপাদানের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

জল

পূর্বোক্ত পৌষ্টিক উপাদানগুলি ছাড়াও আমদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে জলের দরকার হয়। আমাদের দেহের দুই-তৃতীয়াংশ জল দিয়ে তৈরি। অনেক জিনিসই যেমন 'বি'-জাতীয় খাদ্যপ্রাণসমষ্টি জলের সাহায্যেই শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। দেহের ভিতরে রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির জন্য জলের প্রয়োজন। জল শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। জল পান করলে অথবা জলীয় খাদ্য গ্রহণ করলে আমরা প্রয়োজনীয় জল পাই। দুধে শতকরা 80-90 ভাগ, মাংস, ডিম এবং আলুতে শতকরা 70 ভাগ জল আছে, ফল ও সব্জীতে জলের ভাগই বেশি।

তালিকা 1.1 খাদ্যের পৌষ্টিক উপাদান

পৌষ্টিক উপাদান	কি কাজ করে	উৎস	অপুষ্টিজনিত উপসর্গ
মুখ্য পৌষ্টিক উপাদানসমূহ			
শ্বেতসার (মণ্ডশর্করা ও শর্করা)	শরীর চালনার জন্য তাপ (ক্যালরি) যোগায়	চাল, গম, অন্যান্য শস্যখাদ্য, আলু, চিনি, গুড়	কম ওজন, দুর্বলতা, মূর্ছা
প্রোটিন	দৈহিক উপাদান গঠন ও রক্ষা করা, ক্যালরির ঘাটতি পূরণ করে দেহে তাপসঞ্চার করা	ডাল, বাদাম, দুধ, ডিম, মাছ, মাংস	খর্বতা, কম ওজন, ওজন কমে যাওয়া, অস্বাস্থ্যকর ফোলা
স্নেহজাতীয় পদার্থ ও তেল	কাজ করবার উপযোগী ঘনীভূত তাপ প্রদান করে, কয়েকটি খাদ্যপ্রাণ যথা 'এ', 'ডি' ও 'ই' সরবরাহ করে।	উদ্ভিজ্জ তেল, বনস্পতি, ঘি, চিনাবাদাম, তুলা-বীজ	ওজন কম, কর্কশ বা রুক্ষ ত্বক

পৌষ্টিক উপাদান	কি কাজ করে	উৎস	অপুষ্টিজনিত উপসর্গ
কয়েকটি গৌণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পৌষ্টিক উপাদান			
খাদ্যপ্রাণ	কোন কাজে অবশ্য প্রয়োজনীয়		
'এ'	শরীরের বাড়, দৃষ্টিশক্তি, সুস্থ ত্বক, মজবুত হাড় ও দাঁত, রোগের ছোঁয়াচ প্রতিরোধ করা	টাটকা শাকসব্জী, হলুদবর্ণের ফল (পেঁপে, আম), গাজর, যকৃৎ	শুষ্ক, কর্কশ ত্বক, স্বল্পালোকে কম দেখা, প্রখর আলোয় চোখে কষ্ট—এমনকি দৃষ্টিহীনতা
'সি'	রোগের ছোঁয়াচ প্রতিরোধের ক্ষমতা, দাঁত ও মাড়ীর পুষ্টি, দেহকোষ গঠন ও মেরামত	আমলকী, লেবু, বাতাবিলেবু, কমলালেবু, টমেটো, সজনে পাতা, বাঁধাকপি. কল-বেরুনো ডাল ও ছোলা	সহজেই রক্তপাত, ক্ষত সারতে দেরী হওয়া, দাঁতনড়া ও মাড়ী ফোলা
'বি$_{12}$'	লাল রক্তকণিকা গঠন	মাংস, যকৃৎ, ডিম ও দুধ	স্ত্রীলোকের রক্তশূন্যতা
ফলিক অ্যাসিড	লাল রক্তকণিকা গঠন	মাংস, যকৃৎ, ডাল, বীন, ছোলা, কাঁচা শাকসব্জী	শিশু ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের রক্তশূন্যতা
থায়ামিন বি	শরীরে শ্বেতসারের যথাযথ প্রয়োগে সাহায্য করা	জাঁতায় পেশা গম, ঢেঁকিছাঁটা চাল, ডাল, বাদাম, মাংস ও যকৃৎ	ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, খিটখিটে স্বভাব

পৌষ্টিক উপাদান	কি কাজ করে	উৎস	অপুষ্টিজনিত উপসর্গ
রিবোফ্লাবিন (বি$_2$)	দেহকোষের যথাযথ বিকাশ ও পুষ্টি	যকৃৎ, ডাল, দুধ, টাটকা শাকসব্জী	চোখ কড়কড় করা, জিভে ঘা, ঠোঁটের দু-পাশ ফাটা, শুষ্ক ত্বক
নিয়াসিন	শ্বেতসারকে সঠিক কাজে সাহায্য, দেহকোষের ক্রিয়া-পরিচালনা ও পুষ্টিসাধন	চিনাবাদাম, ডাল, আভাঙ্গা গম, ঢেঁকিছাঁটা চাল	ত্বক লাল হওয়া ও চুলকনা, ক্ষুধামান্দ্য, পেটের অসুখ
ধাতব পদার্থ			
চুন (ক্যালসিয়াম)	দাঁত ও হাড়ের গঠন, রক্তে জমাটবাঁধা	দুধ, মাখনতোলা দুধ, মাছ, রাগী, ডাল, তিল, ধনে দানা	খর্বাকৃতি, খারাপ দাঁত ও হাড় (রিকেটস্)
লৌহ	লাল রক্তকণিকা গঠন	টাটকা শাকসব্জী, রাগী, বাজরা, মেথি, যকৃৎ, ডিম	রক্তশূন্যতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুষমখাদ্য বলতে কি বুঝায়

আগের পরিচ্ছেদে আমরা, শ্বেতসার, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ, খাদ্যের এই পাঁচটি মুখ্য উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি কোন্ কোন্ খাদ্য থেকে এগুলি পাওয়া যায় ও সেই সঙ্গে জেনেছি শরীররক্ষায় এদের প্রয়োজনীয়তা কি ? এরপর, এই পৌষ্টিক উপাদানগুলি সঠিক পরিমাণে কি উপায়ে পাওয়া যায়, তা জানা দরকার, কারণ এগুলির পরিমাণ খুব কম হলে আমাদের স্বাস্থ্যহানি হবে আর খুব বেশি হলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল পাওয়া যাবে না।

এটা ঠিক যে বিভিন্ন বয়সের লোক বিভিন্ন রকমের আহার করে। একটি ছোট শিশু, স্কুলে যায় এমন বয়সের শিশুর অপেক্ষা কম পরিমাণ আহার করে। পূর্ণবয়স্ক লোকের তুলনায়, স্কুলের শিশু কম খাদ্য গ্রহণ করে। যারা লেখাপড়া বা বসে কাজ করে তাদের চেয়ে, যারা কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করে তাদের অধিক পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। অধিক পরিমাণ খাদ্য, মানে অধিক পরিমাণ শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহ-পদার্থ ; খাদ্যের মুখ্য উপাদান ক'টি। প্রতিটি অপ্রধান পৌষ্টিক উপাদানের প্রয়োজন পৃথকভাবে নির্দেশ করা যায়। যেমন গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের বেশি ক্যালসিয়াম (চুন) খাওয়ার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যের

পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেয়ে যে সব খাদ্যে চুন থাকে তা আহার করলে প্রয়োজন মিটে যায়।

পৌষ্টিক উপাদানগুলি কি পরিমাণে আমাদের প্রয়োজন

বিভিন্ন বয়সের মানুষের প্রত্যহ কি পরিমাণ বিভিন্ন পৌষ্টিক উপাদানের প্রয়োজন তা ভারতবর্ষের ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা যত্নসহকারে পরীক্ষা করে আবিষ্কার করেছেন। তালিকা 2.1-এ ক্যালরি, প্রোটিন এবং কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থের "দৈনিক অনুমোদিত পরিমাণ" যেভাবে বোঝানো হয় তা দেখানো হয়েছে। তালিকাটি দেখুন। পুরুষ মানুষ আকৃতিতে স্ত্রীলোক অপেক্ষা বড়, তাই এদের অধিক পরিমাণ ক্যালরি ও প্রোটিনের প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে স্ত্রীলোকের অধিক পরিমাণ ক্যালরি ও প্রোটিন দরকার হয়। এ সময়ে তাদের শরীরে ক্যালসিয়াম, লৌহ ও খাদ্যপ্রাণের চাহিদাও বেড়ে যায়। মেয়েদের এই সব সঙ্কটকালে পরিমাণে অধিক ও বিশেষ ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

শিশুরা কম খায়, তাদের ক্যালরি ও প্রোটিন কম পরিমাণে প্রয়োজন হয়। কিন্তু তারা ছোট হলেও তাদের ক্যালসিয়াম ও লৌহের বিশেষ প্রয়োজন। হাড় ও দাঁতের জন্য ক্যালসিয়াম এবং রক্ত তৈরির জন্য লৌহের দরকার। অধিক পরিমাণে প্রয়োজন না হলেও ভালো দৃষ্টিশক্তির জন্য খাদ্যপ্রাণ 'এ' অত্যাবশ্যক।

একটি বিষয় লক্ষ্য করুন, স্নেহপদার্থ একটি মুখ্য পৌষ্টিক উপাদান হওয়া সত্বেও এই তালিকায় স্থান পায় নি। কারণ এই তালিকার প্রস্তুতকারক "ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ"-এর মতে বয়স অনুপাতে কি পরিমাণ স্নেহপদার্থ দরকার তাহা সঠিক জানা যায় না। এঁরা সাধারণভাবে সুপারিশ করেছেন, 15 শতাংশ ক্যালরি স্নেহপদার্থ যোগাবে। তার মানে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক 35-40 গ্রাম

তালিকা 2.1 প্রতিটি পৌষ্টিক উপাদানের কতটা আমাদের দরকার ?

			খনিজ		খাদ্যপ্রাণ							
	ক্যালরি	প্রোটিন	ক্যালসিয়াম	লোহ	এ	ডি	ফঃ অ্যাসিড	বি$_{12}$	সি	থায়ামিন	রিবো-ফ্লাভিন	নিয়াসিন
		গ্রাম	মিগ্রাঃ	মিগ্রাঃ			মাইক্রোগ্রাম			মিলিগ্রাম		
সাধারণ ব্যক্তি	2,800	55	450	20	750	5	100	1·0	50	1·4	1·5	19
সাধারণ স্ত্রীলোক	2,200	45	450	30	750	7·5	100	1·0	50	1·1	1·2	15
গর্ভবতী স্ত্রীলোক (শেষ 4 মাস)	2,500	55	1000	40	750	5	225	1·5	50	1·3	1·4	17
স্তন্যদাত্রী মা (সারা বছর)	2,900	65	1000	30	1,150	5	150	1·5	80	1·5	1·6	20
কিশোর বালক (13-15 বৎসর)	2,500	55	650	25	750	5	75	0·8	40	1·3	1·4	17
কিশোরী বালিকা 13-15 বৎসর)	2,200	50	650	35	750	5	75	0·8	40	1·1	1·2	14
শিশু (1 বছর)	1,200	17	450	18	250	5	75	0·8	40	0·6	0·7	8
শিশু (5 বছর)	1,500	22	450	20	300	5	75	0·8	40	0·8	0·8	10

বিশেষ প্রয়োজনে বোঝাবার জন্য সংখ্যার নিচে দাগ দেওয়া হয়েছে।

স্নেহপদার্থ আহার করা উচিত। এর মধ্যে প্রায় 15 গ্রাম উদ্ভিজ্জ যেমন কারড়ি, সূর্যমুখী, তিল, তুলাবীজ ও বাদামের তরল তেল হওয়া দরকার যাতে পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড সংক্ষেপে PUFA থাকে। প্রথম পরিচ্ছেদে "PUFA"-যুক্ত তেলের অনুকূলে যে সব যুক্তি দেওয়া হয়েছে তার কারণ, PUFA ছাড়া অন্য তেলে রক্তসংবাহী শিরাগুলি শক্ত হয়ে যায় যার ফলে হৃদ্‌রোগ দেখা দেয়।

প্রতিদিন আমাদের যে অনুমোদিত পরিমাণ পৌষ্টিক উপাদান গ্রহণ করতে সুপারিশ করা হয়েছে কারণ স্বাস্থ্যরক্ষা ও দৈহিক বিকাশের জন্য বিশেষ কতগুলি খাদ্যদ্রব্য থেকে আমরা সঠিক পরিমাণ বিভিন্ন পৌষ্টিক উপাদান পাই। এরপর আমরা আলোচনা করবো কি খাদ্যদ্রব্য প্রত্যহ আহার করলে এই সকল পৌষ্টিক উপাদান পাওয়া যাবে।

সুষমখাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য

পুরুষ, স্ত্রীলোক, কিশোর, বালক ও শিশুদের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য কি পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত তার কয়েকটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলিকে সুষমখাদ্য বলা হয়। সুষমখাদ্য বলতে বোঝায় যথেষ্ট পরিমাণে নানাপ্রকার খাদ্য যাতে প্রয়োজনীয় পৌষ্টিক উপাদান-গুলি সঠিক পরিমাণে থাকে। তালিকা 2.2-তে গ্রাম হিসাবে বিভিন্ন খাদ্যের পরিমাণ দেওয়া হয়েছে। এতে বয়স অনুপাতে কোন্ খাদ্য কত গ্রাম আহার করা উচিত তা দেখানো হয়েছে। এই তালিকায় আমিষ ও নিরামিষ দুই প্রকার খাদ্যের কথাই আছে।

এই তালিকা দুটি পড়বার সময় পূর্ব পরিচ্ছেদের কয়েকটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে। তালিকা 2.3 এই জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, এতে সাধারণ কয়েকটি ভারতীয় খাদ্যের মান দেওয়া আছে।

শস্যখাদ্য

ভারতবর্ষে সাধারণত চাল, গম, বাজরা, জোয়ার ও রাগী প্রভৃতি শস্যখাদ্য খাওয়া হয়। এগুলি সস্তা ও আমাদের প্রধান খাদ্য। এতে যে মণ্ড-শর্করা থাকে তা আমাদের ক্যালরির চাহিদার বেশির ভাগই যোগায়। এই শস্যখাদ্যগুলিতে 6 থেকে 11 শতাংশ প্রোটিন থাকায় এ থেকেও আমরা অনেকটা প্রোটিন পাই। কেউ যদি দিনে 250 গ্রাম ভাত ও 100 গ্রাম গমের আটার রুটি খায় তা থেকে সে দৈনিক প্রায় 25 গ্রাম প্রোটিন পাবে। আমরা জানি এ প্রোটিন মধ্যম শ্রেণীর, নানা-প্রকার শস্যখাদ্যের মধ্যে চাল ও রাগীতে উৎকৃষ্ট,প্রোটিন থাকে। আছাঁটা চালে কিছু পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ 'বি' থাকে, কিন্তু ছাঁটাই করার সময় তুষের সঙ্গে তা বেরিয়ে যায়। ধান সিদ্ধ করলে এই খাদ্যপ্রাণ চালের গায়ে লেগে যায়, ফলে ছাঁটাই করলেও তা নষ্ট হয় না। অধিকাংশ শস্যখাদ্যে, বিশেষ করে চালে খনিজ কোন পৌষ্টিক উপাদান থাকে না। এর মধ্যে রাগীই একমাত্র ব্যতিক্রম যাতে সাদা রঙের খনিজ পৌষ্টিক উপাদান 'ক্যালসিয়াম' বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের ও বাড়ন্ত শিশুদের মজবুত দাঁত ও হাড় গঠনের জন্য এই পৌষ্টিক উপাদানটির বিশেষ প্রয়োজন।

ডাল বলতে বিভিন্ন প্রকারের ডাল ও ছোলা বোঝায়। ভারতীয় খাদ্যে প্রোটিনের একটা বড়ো অংশ এরা যোগায়। আমরা আগেই দেখেছি ডালের ও ভাতের প্রোটিন একটি অন্যের উত্তম পরিপূরক, এবং এদুটি যেমন খাওয়া হয় তেমনি একসঙ্গে খেলে প্রোটিনের মান উন্নত হয়। এ রকম কেন হয়, তা বোঝবার জন্য প্রোটিন কি উপাদানে তৈরি তা আমাদের জানতে হবে। তেইশটি অ্যামিনো অ্যাসিডের হাজার রকম সংমিশ্রণের ফলে প্রোটিন হয়। প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিড শরীরের প্রয়োজনে লাগে। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে যে রাসায়নিক উপাদান থাকে তা দিয়ে আমাদের শরীর কয়েকপ্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করে

তালিকা 2.2 সুষমখাদ্য পেতে হলে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যের কতটা প্রয়োজন

(গ্রাম হিসাবে)

	সাধারণ পুরুষ		সাধারণ স্ত্রীলোক		কিশোর (13-15 বৎসর)		শিশু (5 বৎসর)	
	নিরামিষ	আমিষ	নিরামিষ	আমিষ	নিরামিষ	আমিষ	নিরামিষ	আমিষ
শস্যখাদ্য (চাল, গম প্রভৃতি)	475	475	350*	350	430	430	200	200
ডাল (নানাবিধ ডাল, চিনাবাদাম, নারকোল, পরিবর্তে তিল)	80	65	70	55	70	50	60	50
টাটকা শাকসব্জী (পালং ও মেথি)	125	125	125*	125	100	100	75	75
অন্যান্য সব্জী (কাঁচা ও রাঁধা)	75	75	75	75	75	75	50	50
মূল ও কন্দ (আলু, রাঙালু, চুপড়ি আলু ও টেপিওকা)	100	100	75	75	75	75	50	50
ফল (পেঁপে, কলা, কমলালেবু, আম)	30	30	30	30	30	30	50	50
দুধ	200	100	200*	100	250	150	250	200
স্নেহপদার্থ ও তেল (চিনাবাদাম অথবা অন্যান্য তেল, বনস্পতি, ঘি)	40	40	35	40	35	40	25	25
মাংস ও মাছ	—	30	—	3	—	30	—	30
ডিম	—	30	—	30	—	30	—	30
চিনি ও গুড়	40	40	30*	30	30	30	40	40

শস্যখাদ্য 1/4 কাপ, প্রায় 25 গ্রামের মত ; এক মুঠো ডাল 40 গ্রাম, এক কাপ দুধ অথবা দই 250 গ্রাম।

* গর্ভাবস্থায় এইগুলির বেশি মাত্রায় প্রয়োজন হয় বিশেষ করে স্তন্যদানকালে।

তালিকা 2.3 কয়েকটি প্রচলিত ভারতীয় খাদ্যের পুষ্টির মান

(শত গ্রাম খাদ্যে কত গ্রাম থাকে)

	ক্যালরি	জল	শ্বেতসার	প্রোটিন	স্নেহপদার্থ	অন্যান্য পৌষ্টিক উপাদান
শস্যখাদ্য						
চাল	345	14	79	7	1/2	—
গম	350	13	74	11	1	—
জোয়ার	350	12	73	10	2	—
রাগী	330	13	72	7	1	ক্যালসিয়াম
ডাল ও শুটি						
অড়হর ডাল	335	13	58	22	2	'বি'-গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ
কলাই ডাল	350	11	60	24	1	ঐ
মুগ ডাল	350	10	60	25	1	ঐ
ছোলার ডাল	360	10	60	21	6	ক্যালসিয়াম 'বি' গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ
মূল ও কন্দ						
আলু	100	75	23	2	—	অল্প পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ 'সি'
রাঙালু	120	69	28	1	—	ঐ
টেপিওকা	160	60	38	1	—	ঐ
চুপড়ি আলু	110	70	26	1	—	—

বাদাম, তৈলবীজ ও তেল						
চিনাবাদাম	570	3	27	26	40	'বি'-গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ
তিল	560	5	25	18	43	ক্যালসিয়াম, 'বি'-গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ
নারকোল (ডাব)	440	36	13	5	42	—
অন্যান্য তেল কিংবা স্নেহপদার্থ	900	—	—	—	100	—
ডিম, মাছ ও মাংস						
মুরগির ডিম	170	74	—	13	13	'এ' ও 'বি' গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ
কুচোমাছ	100	76	—	20	2	ক্যাসিয়াম, 'বি'-গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ
চিংড়ি	90	77	1	19	1	—
মাংস (ছাগল বা ভেড়ার)	120	74	—	21	4	লৌহ, 'এ' ও 'বি' গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ
দুধ এবং দুগ্ধজাত						
মহিষের দুধ	210	81	5	4	9	ক্যালসিয়াম, 'এ' ও 'বি' গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ
গরুর দুধ	120	87	4	3	4	ঐ
দই	60	89	3	3	4	ঐ
মাখনতোলা দুধগুঁড়ো	360	4	51	38	—	ক্যালসিয়াম, 'বি'-গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ
ঘি	900	—	—	—	100	খাদ্যপ্রাণ 'এ'
চিনি	400	—	100	—	—	—

তালিকা 2.4 **টাটকা শাকসব্জীতে খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থের পরিমাণ**

খাদ্যপ্রাণ	প্রচলিত উৎস		পালং শাক	কেরাই শাক	কচু পাতা	সজনে পাতা	সরষে শাক	মেথি শাক	পূর্ণবয়স্ক পুরুষের জন্য অনুমোদিত দৈনিক প্রয়োজন
			(প্রতি 100 গ্রাম শাকসব্জীতে কত পরিমাণ থাকে)						
খাদ্যপ্রাণ 'এ'	গাজর	1800							
(মাইক্রোগ্রাম)	ঘি	1,600	5,600	5,500	10,000	7,000	1,300	2,300	750
	পেঁপে	660							
খাদ্যপ্রাণ 'বি'-	ডিম	1,800							
গোষ্ঠী	মাংস	600	800	1,500	1,600	1,000	900	1,150	25
(মাইক্রোগ্রাম)	পেঁপে	500							
খাদ্যপ্রাণ 'সি'	আমলকী	600							
(মিলিগ্রাম)	লেবুর রস	40	30	100	12	220	60	50	50
	পেঁপে	50							
ক্যালসিয়ম	রাগী	350							
(মিলিগ্রাম)	চিংড়ী	300	70	400	220	450	370	400	400 500
	পমফ্রেট মাছ	200							
	দুধ	200							
লৌহ	যকৃৎ	6							
(মিলিগ্রাম)	কুঁচোমাছ	6	10	25	10	7	12	17	20
	মাংস (ছাগল বা ভেড়ার)	3							

নেয়। আট রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের শরীরে আদৌ তৈরি হয় না। এই আটটিকে বিশেষ প্রয়োজনীয় অ্যাসিড বলা হয়। কারণ এগুলি দেহতন্তু গঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড পেতে হলে অ্যামিনো অ্যাসিড আছে এমন প্রোটিন-যুক্ত খাদ্য আমাদের আহার করতে হবে। সাধারণত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে দুটির, যথা লাইসিন ও মেথিওনিন-এর অভাব হয়। কয়েকপ্রকার খাদ্যে যেমন ভাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাইসিন পাওয়া যায় না। আবার কয়েকপ্রকার খাদ্যবস্তুতে, যেমন ডালে 'লাইসিন্' পাওয়া যায়, কাজেই ডাল ভাত একসঙ্গে খেলে যা প্রোটিন পাওয়া যায় তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাইসিন থাকে। অধিক পরিমাণে মেথিওনিন সাধারণত জৈব প্রোটিন, যেমন ডিম, মাংস এবং দুধে পাওয়া যায়। ভাত, রাগী ও তিল প্রভৃতি কয়েকটি নিরামিষ খাদ্যদ্রব্যে অধিক পরিমাণ মেথিওনিন থাকে।

কয়েকটি 'বি'-গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ, বিশেষ করে থায়ামিন (খাদ্যপ্রাণ 'বি$_1$') এবং ফলিক অ্যাসিডের উৎস হল ডাল। সাধারণ চিনাবাদামে বেশি পরিমাণে থায়ামিন আছে। তিলে, চিনাবাদামের থেকে বেশি পরিমাণে থায়ামিন আছে এবং ফলিক অ্যাসিডও এতে খুব বেশি পরিমাণে আছে।

ডালে আর একটি আশ্চর্যজনক জিনিস হয়। ডালে কল বেরুলে (জলে ভিজিয়ে রাখার দু-একদিন পর ছড়িয়ে দিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়) 'সি' খাদ্যপ্রাণ জন্মায়। এভাবে কল-বেরুনো কাঁচা মুগ ডাল ও কাবলি ছোলা খুব উপকারী।

টাটকা শাকপাতা বলতে পালং ও নটেশাক, মুখিকচু, সজনে পাতা, সরষেশাক ও মেথিশাক প্রভৃতি অনেক রকমের শাক বোঝায় যা দেশীয় খাদ্যে সচরাচর থাকে। তালিকায় দেখা যায় এই শাকপাতায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও লৌহ থাকে, এছাড়া খাদ্যপ্রাণ 'এ'

'বি'-গোষ্ঠী ও 'সি'-তে এগুলি ভরপূর হয়। বাস্তবিকই এদের খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থের ঘনীভূত 'বড়ি' বা 'টনিক' বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ সব শাকপাতা দামে সস্তা ও বাড়িতে জন্মানো যায়। তালিকা 2.4 দেখলে এদের উপকারিতা ও সুবিধা মতো বারবার খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা জানা যাবে।

অন্যান্য শাকসব্জী

এই সকল শাকসব্জীকে মূল, কন্দ, রেঁধে ও কাঁচা খাবার সব্জী অনুসারে ভাগ করা যায়। মূল ও কন্দের মধ্যে পড়ে ট্যাপিওকা (যা কেরলে বেশি খাওয়া হয়), আলু, রাঙালু, চুপড়ি আলু ও মুখিকচু। এই জাতীয় খাদ্যবস্তুতে সুপাচ্য মণ্ড-শর্করা থাকায় এগুলিও ক্যালরির উৎস। বেগুন, বীন, বিবিধ রকমের মটর, লাউজাতীয় সব্জী (যেমন কুমড়া, চালকুমড়া, কাঁকুড় ইত্যাদি), কাঁচকলা, এঁচড়, ঢ্যাঁড়শ, সজনেডাঁটা, ওল, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বীট ইত্যাদি হল রেঁধে খাওয়ার তরকারি। এদেশে রেঁধে খাওয়ার তরকারি বেশি। এসব তরকারি আমাদের আহারের স্বাদ, গন্ধ ও বৈচিত্র্য আনে, খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থও যোগায়। এতে কিছু দুষ্পাচ্য আঁশ থাকে যা খাদ্যের ছিবড়া হয়ে হজমের সহায়তা করে। সাধারণত এদেশে রাঁধা তরকারির বিশেষ কোন পৌষ্টিক মূল্য নেই। অনেকক্ষণ ধরে ভাজলে বা সিদ্ধ করলে, অথবা সিদ্ধ করার পর সেই জল ফেলে দিলে এ সমস্ত সব্জীর খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থ নষ্ট হয়ে যায় ও তাতে এর পৌষ্টিক মূল্যের আরো অবনতি হয়।

অন্যদিকে কাঁচা খাবার শাকসব্জী আমাদের খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থের চাহিদা অনেকটা মেটাতে পারে। কাঁচা খাবার সব্জীর মধ্যে পড়ে কুঁচানো পেঁয়াজ, টমাটো, গাজর, মূলা এবং শশা। নারকোল, তেঁতুল, পেঁয়াজ ও তিল এ ধরনের সব্জীর সঙ্গে খানিকটা লেবুর রস

মিশিয়ে চাটনি তৈরি করলে, কাঁচা খাওয়ার তরিতরকারির মতো আর একটি পদ হয়।

ফল

ফল খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থের উত্তম উৎস। পেঁপে, আম, খাদ্যপ্রাণ 'এ'-তে ভরপুর, আর আমলকী, পাতিলেবু ও কাজুবাদামে থাকে খাদ্যপ্রাণ 'সি'। সাধারণত আতায় অধিক মাত্রায় থাকে খাদ্যপ্রাণ 'বি$_1$' 'বি$_2$' ও নিয়াসিন, বেশ কিছুটা খাদ্যপ্রাণ 'সি' আর যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা। কলায় অধিক পরিমাণে মণ্ডশর্করা ও কিছুটা খাদ্যপ্রাণ 'সি'ও পাওয়া যায়। ন্যাসপাতির মতো সবজে-হলুদ শাঁস-ওয়ালা 'বাটারফ্রুট' (butterfruit)-এ অধিক মাত্রায় (23 শতাংশ) স্নেহপদার্থ থাকে। আঙুর ও আপেলে অতি উচ্চমানের এমন কোন বিশেষ পৌষ্টিক মূল্য নেই। দিনে একটি করে আপেল খেলে ডাক্তার ডাকতে হয় না, এ ধারণা ভুল। বরং আপেলের যা দাম তাতে প্রত্যহ আপেল খেতে হলে মহাজনের দ্বারস্থ হতে হবে।

দুধ মানুষের প্রকৃতিদত্ত একটি স্বাভাবিক খাদ্য। জন্মের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ মায়ের দুধ শিশুর একমাত্র পথ্য। সেজন্য দুধে প্রায় সমস্ত পৌষ্টিক উপাদান—শ্বেতসার (ল্যাকটোজ বা দুগ্ধশর্করা), প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থ, সুষম পরিমাণে পাওয়া যায়। গরু-মহিষের দুধও প্রায় এরকম পৌষ্টিক উপাদানে পরিপূর্ণ। মায়ের দুধের চেয়ে গরু ও মহিষের দুধে কম শর্করা থাকে কিন্তু প্রোটিন থাকে বেশি, আরও বেশি থাকে স্নেহপদার্থ। তাই এর সঙ্গে সাধারণত জল ও সামান্য চিনি মিশিয়ে শিশুদের খাওয়ানো হয়। বৃদ্ধদেরও দুধ পান করা ভাল, বিশেষ করে যারা নিরামিষাশী, কারণ দুধের জৈব স্নেহপদার্থ উচ্চমানের হয়। দুধে চুনের অংশ যথেষ্ট থাকে কিন্তু খাদ্যপ্রাণ 'সি' ও লৌহের অংশ থাকে অতি সামান্য।

দুধের জল অর্ধেক কমিয়ে ফেললে তা মিষ্টতাবিহীন ঘন দুধ (কনডেন্সড মিল্ক) কিংবা বাষ্পীকৃত (evaporated) দুধে পরিণত হয়। আরও জল কমিয়ে ফেলে তাতে মিষ্টি মেশালে তা হয় মিষ্টি ঘন দুধ।

দুধ থেকে সমস্ত জলীয় অংশ শুকিয়ে ফেললে গুঁড়ো দুধ হয়। জল মিশিয়ে নিলে সেই দুধ আবার স্বাভাবিক দুধে পরিণত হয়। সাধারণ গুঁড়ো দুধে স্নেহপদার্থ বেশি থাকে বলে তাড়াতাড়ি এতে টক্ গন্ধ হয়ে যায়। বাজারে সচরাচর যা বিক্রি হয় তা মাখনতোলা গুঁড়ো দুধ। দুধের মাখন তুলে নিলে স্নেহপদার্থও কমে যায়। প্রথমে তাই দুধের মাখন তুলে পরে এর জল শুকিয়ে ফেললে স্নিহিগুঁড়ো দুধ হয়। ভারতবর্ষের বড়ো-বড়ো শহরে দুধকে সুষম অর্থাৎ টোনড করা হয়। প্রথমে মহিষের দুধের কিছুটা স্নেহপদার্থ তুলে নিয়ে তাতে মাখনতোলা গুঁড়ো দুধ মিশানো হয় যাতে সেই দুধে, মাখন তুলে নেওয়া স্নেহপদার্থের সমান সমান শ্বেতসার ও প্রোটিন মিশে থাকে। এর ফলে টোনড করা আসল দুধের চেয়ে কম মাখন কিন্তু বেশি প্রোটিন ও দুগ্ধশর্করা থাকে।

মাখনতোলা দুধের থেকে দই করলে তাতে দুধের সমস্ত পৌষ্টিক উপাদান থাকে। দই মন্থন করে মাখন তুলে নিলে, অবশিষ্ট ঘোলে প্রোটিন, শর্করা, খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থ প্রভৃতি পৌষ্টিক উপাদানগুলি পাওয়া যায়। শুধু স্নেহপদার্থ ও খাদ্যপ্রাণ 'এ' যা এর সঙ্গে মিশে থাকে তা মন্থন করায় নষ্ট হয়ে যায়।

ঘি ও তেল

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি চিনি মানেই শুদ্ধ শ্বেতসার, ঘি ও তেল মানে শুধু স্নেহপদার্থ। তাই সব রকম স্নেহপদার্থের প্রতিটি গ্রাম থেকে একই পরিমাণ ক্যালরি উৎপন্ন হয়। এই ভাবে দেখলে বলা যায় ঘি, বনস্পতি, বাদামতেল, সূর্যমুখীর তেল, তিল, সরষে ও নারকোল

তেলের মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য নেই। ব্যক্তিবিশেষের নিজের নিজের পছন্দ মতো স্বাদ, গন্ধের উপর নির্ভর করে সে কোন্ তেল ব্যবহার করবে। কিন্তু কয়েকপ্রকার তেল ও ঘি-তে রক্তসংবাহী শিরাগুলি কঠিন হয়ে যাবার উপকরণ থাকে, সুতরাং সে-সব স্নেহপদার্থ যেমন, ঘি, বনস্পতি, নারকোল ও তিল তেল, প্রভৃতি যা এই অবাঞ্ছিত প্রবণতার সাহায্য করে, তা একেবারে ব্যবহার না করাই উচিত। তাই পরিপূরিত নয় (unsaturated) অথবা 'পিউফা' মিশ্রিত তেল কিছুটা ব্যবহার করা ভাল।

আমরা চিনাবাদাম, তিল, সরষে, সূর্যমুখীর বীজ প্রভৃতি তৈলবীজ অথবা নারকোলের শাঁস থেকে তেল পাই। তাপ ও চাপের সাহায্যে পেষাই করে তৈলবীজ থেকে তেল বার করা হয়। আজকাল্ তৈলবীজ তরল রাসায়নিক দ্রাবক পদার্থ মিশিয়ে তেল বার করা হয়। এই দুই উপায়ে বার করা তেলের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। চল্লিশ বছর আগে এদেশে তৈলবীজ থেকে যেমন অবস্থায় এই সব তেল পাওয়া যেত সে রকমই ব্যবহার করা হত। এই সব তেলের নিজস্ব ও প্রকট গন্ধ থাকত। বিভিন্ন প্রদেশের লোক এক একটি গন্ধ পছন্দ করত যেমন কেরলে নারকোল তেল, পশ্চিমবঙ্গে সরষের তেল, তামিল নাড়ুতে তিল-তেল। আজকাল তেলকে পরিশোধিত করে বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন করার প্রচলন হয়েছে। সাধারণত এই সব পরিস্রুত তেল টিনে বন্ধ করে নানাবিধ ছাপে ও নামে বাজারে বিক্রি হয়। বেশি পরিমাণ বাদামতেল পরিশোধন হয় বলে ভারতবর্ষে পরিস্রুত তেল বলতে বাদামতেল বোঝায়। কিন্তু সব রকম তেলই পরিস্রুত করা যায় বলে আমরা পরিস্রুত নারকোল তেল, সূর্যমুখীর তেল ও তুলাবীজের তেল পাই। এ দেশে কড়া গন্ধের জন্য সরষের তেলের কদর, তাই এ তেল পরিস্রুত করা হয় না যদিও সরষের তেল পরিস্রুত করা যায় এবং অন্যান্য দেশে করাও হয়।

মাংস

মাংস যে রকমই হোক (ছাগল বা ভেড়া, মুরগি, শুয়োর অথবা গোরুর) তাতে উত্তম মানের মূল্যবান প্রোটিন 'বি'-গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ ও লৌহ প্রভৃতি খনিজপদার্থ থাকে। মাছ ও প্রোটিন ও 'বি'-গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণে পূর্ণ। মাছের চিবিয়ে খাওয়ার মত নরম কাঁটা থেকে আমরা ক্যালসিয়াম পাই।

খাদ্যপ্রাণ 'বি$_{12}$' মাংস ও মাছের মত মাংসল খাদ্যে থাকে। ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুর মেটুলি 'এ' ও 'বি'-গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণের উৎস, এ-ছাড়া এতে লৌহও থাকে। শরীরের প্রয়োজনীয় আর একটি খনিজ-পদার্থ ফসফরাসের উত্তম উৎস হল, মেটুলি, মাছ, বাগ্‌দা ও কুঁচো-চিংড়ি।

ডিম

ডিমে সেইসব পৌষ্টিক উপাদান থাকে যা এর ভিতরের বাচ্চাটিকে বাড়তে সাহায্য করে, সুতরাং ডিম যে একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ডিমে উৎকৃষ্ট মানের প্রোটিন, অধিক পরিমাণ স্নেহ-পদার্থ, খাদ্যপ্রাণ 'এ' ও 'বি', লৌহ, ক্যালসিয়াম ও কিছুটা ফসফরাস থাকে, শুধু খাদ্যপ্রাণ 'সি' ডিমে নেই। গন্ধ ছাড়া, হাঁস ও মুরগির ডিমে কোন পার্থক্য নেই বললেই চলে। কাঁচা ডিমে এমন কয়েকটি উপাদান থাকে যা পুষ্টির দিক থেকে অনুপকারী, সেজন্য ডিম সিদ্ধ করে বা ভেজে খাওয়া উচিত। আধুনিক হাঁস-মুরগি-পালনকেন্দ্র একরকম ডিম উৎপন্ন করেছে যাকে 'বাওয়া' ডিম বলে, এর থেকে বাচ্চা হয় না। যারা আমিষখাদ্য গ্রহণ করে না তারাও বাওয়া ডিম খেতে পারে। অনেকের ধারণা দেশী অথবা গৃহপালিত হাঁস, মুরগির ডিমের তুলনায় বাওয়া ডিম সাধারণ ডিমের দ্বিগুণ হওয়ায় এতে পৌষ্টিক উপাদান থাকে অনেক বেশি।

চিনি

চিনি ও গুড় হল শুদ্ধ শ্বেতসার। গুড়ে ক্যালসিয়াম থাকে ও জ্বাল দেবার সময় এতে কিছুটা লৌহ মিশে যায়। পরিস্রুত করা হয় বলে চিনিতে এসব কিছুই থাকে না।

ফোড়ন ও মশলা যদিও সুষমখাদ্য তালিকায় স্থান পায় নি, তবুও আমরা এখানে এ সব নিয়ে আলোচনা করতে পারি। ফোড়ন ও মশলা অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা হয় বলে আমাদের খাদ্যে এদের পৌষ্টিক অবদান খুবই কম। ধনে ও পাকালঙ্কায় খাদ্যপ্রাণ 'এ', 'সি' ও কাঁচালঙ্কায় 'বি'-গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়। হলুদ ও তেঁতুলে লৌহ ও আরো কয়েকটি মশলায় (যেমন জিরা, ধনে, গোলমরিচ ইত্যাদি) ক্যালসিয়াম থাকে। রসুন ও হিং-এ এরকম উপাদান আছে যা অন্ত্রের মধ্যে খাদ্যের পচন নিবারণ করে।

জল

আমাদের আহারের আর একটি প্রয়োজনীয় বস্তু হল জল। একজনের কতটা জল দরকার হয় তার সহজ হিসাব হল যদি তার 2200 ক্যালরির প্রয়োজন হয় জলও তার লাগবে 2000 সি সি (c.c.)। সাধারণত আমাদের খাবারে এর অর্ধেক পরিমাণ জল থাকে। এ হিসাবে বলা যায় একজন লোক যে সাধারণ কাজ করে তার প্রায় 1000-1200 সি সি জলপান করা দরকার। চা, কফি, দুধ, লস্যি ইত্যাদি পান করলে তার এই পরিমাণ জলের চাহিদা মিটবে। গরম, অতিরিক্ত পরিশ্রম, খেলাধূলা ও উদরাময় রোগে আমাদের জলের চাহিদা বেড়ে যায়। পর্যাপ্ত পরিমাণে জলপানের দিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার, কারণ তা না হলে আমরা খাদ্যের উপকারিতা পুরোমাত্রায় লাভ করতে পারবো না এবং পৌষ্টিক উপাদানগুলির অপচয় হবে।

তালিকা 2.5 একটি পরিবারের
(পরিবারে থাকবে একজন পুরুষ, তাঁর স্ত্রী 13 বছরের একটি

আমিষভোজী

খাদ্যতালিকা	কাঁচা সব্জীর ওজন গ্রাম হিসাবে	
প্রাতঃভোজন		
রুটি	আটা	450
বাঁধাকপি এবং আলু	বাঁধাকপি	200
অমলেট	আলু	100
কফি	ডিম	150
	দুধ	150
	কফি	
মধ্যাহ্নভোজন		
ভাত	চাল	500
চিচিংঙ্গের	চিচিঙ্গে	200
পোরিয়েল	পালংশাক	275
পালংশাকের সম্বার	ডাল	160
দই	দই	200
তরমুজ	তরমুজ	190
চা পান		
নারকোল-চিনির বরফি	গমের আটা	80
কাবলি ছোলার	কাবলি ছোলা	100
পায়সম্	নারকোল	50
	দুধ	200
নৈশ-ভোজন		
রাগী রুটি	রাগী	150
চাল	চাল	400
মাংসের কিমা ও	মাংস	90
কচুপাতার তরকারি	কচুপাতা	60
রসম	পেঁয়াজ	40
বেগুনের ভর্তা	বেগুন	125
দই	দই	200

বিশেষ দ্রষ্টব্য : 170 গ্রাম তেল ও 180 গ্রাম চিনি ব্যবহার করতে হবে এসব খাদ্য তৈরি করতে।

সুষমখাদ্যের নমুনা

ছেলে, 8 বছরের একটি ছেলে ও 4 বছরের একটি মেয়ে)

নিরামিষ-ভোজী খাদ্যতালিকা	কাঁচা সব্জীর ওজন গ্রাম হিসাবে	
প্রাতঃভোজন		
ইডলি	চাল	250
নারকোলের চাটনি	কলাই ডাল	125
কফি	নারকোল	50
	দুধ	400
	কফি	
মধ্যাহ্নভোজন		
ভাত	চাল	630
কাঁচা আমের চাটনি	কাঁচা আম	100
কেরাই-এর ঝোল	কিরাইশাক	475
মিষ্টি আলুর সম্বার	মসুর ডাল	75
দই	মিষ্টি আলু	200
কুল	(রাঙালু)	
	দই	300
	কুল	90
চা-পান		
মুরুকু	কাবলি ছোলায় ব্যাসন	130
চা	চালের গুঁড়ো	100
	দুধ	200
নৈশ-ভোজন		
রুটি	গমের আটা	600
ওলের তরকারী	ওল	150
বেগুনের চাটনি	বেগুন	75
ঘোল	ঘোল	250

বিশেষ দ্রষ্টব্য : 155 গ্রাম তেল ও 180 গ্রাম চিনি, এ সব খাদ্য তৈরি করতে লাগবে।

খাদ্যতালিকা

হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটুট অব নিউট্রিশন কর্তৃক প্রস্তুত উপরোক্ত খাদ্যতালিকা (তালিকা 2.5) দিয়ে এই পরিচ্ছেদ শেষ করা হচ্ছে। এই তালিকায় পাঁচজনের একটি পরিবারের সকাল, দুপুর, বিকাল ও রাত্রির খাদ্যের বিবরণ ও পরিমাণ দেওয়া হয়েছে। এই পরিমাণ খাদ্য শারীরিক পুষ্টির জন্য আবশ্যক। এই তালিকায় আমিষ ও নিরামিষন এই দুইপ্রকার খাদ্যের আলোচনা করা হয়েছে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে এই তালিকাটি একক উদাহরণমাত্র। প্রতিদিন তো আর একই খাবার খাওয়া হয় না। এই তালিকাটি পাঠক-পাঠিকাদের দৈনিক খাদ্যতালিকা তৈরি করতে সাহায্য করবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষে খাদ্যের ধরন

ভারতবাসী কি খান

সঠিক পরিমাণ পৌষ্টিক উপাদান পেতে হলে আমাদের কত পরিমাণ ও কিরূপ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এই সব তথ্য জানার উদ্দেশ্য সার্থক হবে যদি সেই সঙ্গে আমরা জেনে রাখি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব খাদ্য গ্রহণ করা হয় তার পৌষ্টিক উপাদান প্রয়োজন অনুপাতে কতটা কম।

তালিকা 3.1-এ দেখতে পাবো ভারতবর্ষের চারটি বিশেষ স্থানের অর্থাৎ পশ্চিমে গুজরাট, দক্ষিণে কেরল, পূর্বে কলিকাতা ও উত্তরে পাঞ্জাব অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত গড়ে কতটা খাদ্য গ্রহণ করেন। এই তালিকার তথ্য সংগ্রহ করতে এই চারটি জায়গায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে গৃহিণীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তাঁরা আগের দিন পরিবারের লোকদের জন্য কি কি রেঁধেছিলেন, আর যদি বাহিরে কোন জায়গায় তাঁরা খেয়ে থাকেন, 'তা হলে কি খেয়েছেন' ইত্যাদি প্রশ্ন। এইভাবে যদি বেশ কতগুলি বাড়ী থেকে সর্বস্তরের আয়ের লোকেদের কাছ থেকে যত রকমের খাদ্য তারা গ্রহণ করেছেন সেই তথ্য নির্ভুলভাবে লিখে রাখা হয় তা হলে এরূপ সমীক্ষা থেকে লোকেরা কি খায় তার বিশ্বাস-যোগ্য একটা ধারণা করা যাবে।

তালিকা 3.1 **দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ**

	গুজরাট	কেরল	কলিকাতা	পাঞ্জাব	অনুমোদিত মান
	মাথা পিছু গড় গ্রামের ওজনে				
শস্যখাদ্য এবং গুঁড়া করা শস্য-খাদ্য	425	299	343	519	342
ডাল ও ডালের গুঁড়া	50	26	37	35	68
কাঁচা শাকপাতা	2	5	14	44	106
অন্যান্য সব্জী	78	18	88	93 (অন্যান্য সব্জী ও মূল ও কন্দ)	56
মূল ও কন্দ	34	165	109		63
ফল	—	36	36	13	36
দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য	100	54	106	317	172
চর্বি ও তেল	20	21	22	17	35
মাংস	5	3	12	7 (মাংস, মাছ ও ডিম)	21 (মাংস ও মাছ)
মাছ	2	107	29		
ডিম	—	25	4		13
চিনি ও গুড়	36	37	32	97	38
অন্যান্য দ্রব্য[1]	3	72	78	—	—

[1] এর মধ্যে আছে চা, কফি, বিস্কুট, বান, আচার, পাঁপড়, নারকোল, জমানো মিষ্টির টুকরো ও ফল (যেখানে পৃথকভাবে দেখনো হয় নি)।

যাতে সমীক্ষার ফল একই প্রকার না হয় সে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার উপর তথ্য সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে দুটি সমীক্ষায়, আহার্য হিসাবে ফলের ব্যবহার পৃথক না দেখিয়ে অন্যান্য খাদ্যবস্তুর সঙ্গে দেখানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও খাদ্যবিষয়ে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা কৌতূহল সৃষ্টি করে।

আমাদের খাদ্যে বেশি পরিমাণে কি থাকে

একথা নিশ্চিত যে শস্যখাদ্য অর্থাৎ প্রাথমিক শস্যকণা আমরা বেশি পরিমাণে খাই। দৈনিক যে পরিমাণ শস্যখাদ্য গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে তার অধিক এই শস্যখাদ্য পাঞ্জাব ও গুজরাটে খাওয়া হয়। শস্যখাদ্য ছাড়াও মূল ও কন্দ (যেমন আলু, মিষ্টি আলু, চুপড়ি আলু) প্রভৃতি শরীরে শ্বেতসার সরবরাহ করে, আর এই শ্বেতসারের এক-চতুর্থাংশ থাকে মণ্ড-শর্করা (starch)।

অবশ্য কলিকাতার অধিবাসীদের 343 গ্রাম শস্যখাদ্যের সঙ্গে তাঁদের দৈনন্দিন বরাদ্দ 87 গ্রাম আলু যোগ হওয়ার ফলে আলুর মণ্ড-শর্করা ও শস্যখাদ্যের শ্বেতসার মিলে তাঁদের শ্বেতসারের প্রয়োজন পূরণ হয়, বরং একটু বেশিই হয়। কেরলের ক্ষেত্রে এটা একটা মজার ব্যাপার। সেখানকার লোকেরা প্রতিদিন 299 গ্রাম শস্যখাদ্য আহার করেন যা প্রয়োজন অনুপাতে কম। কিন্তু তাঁরা তার সঙ্গে 165 গ্রাম টেপিওকা খান সেটাও হিসাবে ধরতে হবে। টেপিওকার মধ্যে প্রায় শতকরা 28 মণ্ড-শর্করা থাকে। এছাড়া পাতলা পাতলা শুকনো টেপিওকা এই প্রদেশের একটি বড়ো প্রিয় খাদ্য। তার মধ্যে মণ্ড-শর্করার অংশ শতকরা 85 ভাগ। এর থেকে বলা যায় যে সাধারণ একজন কেরলবাসীর খাদ্যে প্রয়োজন মতো শ্বেতসার থাকে, কখনও কখনও তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষের এই চারটি স্থানেই চিনির ব্যবহার

সন্তোষজনক। এর মধ্যে পাঞ্জাবে চিনি বেশি খাওয়া হয়। চিনি একটি শ্বেতসারপূর্ণ পদার্থ।

সব্জীর ব্যবহারও সন্তোষজনক বলা চলে। পরিমাণে অল্প হলেও সব্জী শরীরে খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থ যোগায় ; আর যোগায় আঁশ যা খাবারকে পরিপাকযন্ত্রের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালনের সহায়তা করে। সাধারণত রান্না-করা সব্জী খাদ্যগুণ কিছু বাড়ায় না কেবল খাবারে নানাবিধ স্বাদ ও গন্ধ যোগায় আর তাকে লোভনীয় করে তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে সাধারণ সব্জীর মধ্যে বেগুন-এর কোন খাদ্য-গুণ নেই, সামান্য চুন, রিবোফ্লেভিন ও নিয়াসিন মাত্র এ থেকে পাওয়া যায়। ডাঁটায় বেশি পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ 'সি' থাকে (প্রতি শ' গ্রামে 120 মিলিগ্রাম) ও বড়ো পাহাড়ী লঙ্কায় (137 মিলিগ্রাম), ওলে (85 মিলিগ্রাম), করলায় (90 মিলিগ্রাম) থাকে কিন্তু ফোটানোর সময় বা ভাজলে সম্ভবত 'সি' খাদ্যপ্রাণ সবটাই নষ্ট হয়ে যায় কারণ হাওয়া, আলো ও গরমে এদের উপর প্রতিক্রিয়া হয়।

আমাদের খাদ্যে কিসের অভাব

তালিকা থেকে দেখা যাবে যে এতে দীর্ঘ সূচীর সমাবেশ করা হয়েছে। স্মরণ থাকতে পারে যে, যখন দুধের পরিমাণ কম থাকে, বিশেষ করে নিরামিষ-ভোজীদের, ডালই তখন প্রোটিনের মুখ্য উৎস। এই বিষয়ে গুজরাট ও কলিকাতার চিত্র খুব সন্তোষজনক নয়। কারণ এখানকার অধিবাসীরা যে পরিমাণ ডাল, দুধ ও নিরামিষখাদ্য গ্রহণ করেন তা প্রয়োজন অনুপাতে কম। বস্তুত শস্যখাদ্য ও ডালের অনুপাত যেখানে 5 : 1 হওয়া বাঞ্ছনীয়, আলোচ্য চারটি স্থানেই শস্যখাদ্যের অনুপাত বেশি। কেরলের অধিবাসীরা অধিক মাত্রায় মাছ খান (দিনে প্রায় 107 গ্রাম), পাঞ্জাবের অধিবাসীরা অধিক মাত্রায় দুধ পান করেন (দৈনিক 317 গ্রাম) তাতে এদের কম ডাল খাওয়ায় প্রোটিনের যে

অভাব তা পূরণ হয়ে যায়। কেবলমাত্র পরিমাণ নয়, গুণের দিক থেকে বিচার করলে এদের খাদ্যে উৎকৃষ্টতর প্রোটিনযুক্ত হয়।

স্নেহপদার্থ, যেমন তেল ও মাখনের ব্যবহার অনুমোদিত পরিমাণ অপেক্ষা কম। যদিও দুধ থেকে স্নেহপদার্থ কিছুটা পাওয়া যায়, কিন্তু দুধই তো পরিমাণে অল্প পান করা হয় কাজেই স্নেহপদার্থও বেশি কি করে পাওয়া যাবে? বলতে গেলে কি, আমাদের খাদ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থ খুবই অবহেলিত। অথচ শরীরের কর্মশক্তি যোগাতে এই স্নেহ-পদার্থ বাদ দেওয়া যায় না। খাদ্যে স্নেহপদার্থের পরিমাণ সঠিক থাকলে খেয়ে পেট ভরে ও তৃপ্তি হয়। এতে খাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই আবার খিদে পায় না এবং আমাদের কাজ করবার ক্ষমতা ও কাজের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা যোগায়। হতে পারে এগুলি সাধারণ ধারণা, কারণ এগুলি কেবলমাত্র অনুভব করা যায়, প্রত্যক্ষ করা যায় না। স্নেহজাতীয় পদার্থের উপর যথাযথ গুরুত্ব কখনই দেওয়া হয় না। এই স্নেহপদার্থের দাম বেশি বলে গৃহিণীরা একে অবহেলা করে থাকেন।

এর পর ধরা যাক সেই সব খাদ্য যা থেকে আমরা খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ-বস্তু পাই। এর মধ্যে পড়ে ফল, কাঁচা খাওয়ার মতো সব্জী, কাঁচা শাক-পাতা। সাধারণত ফল খুবই কম খাওয়া হয়। আর যদিও কলিকাতা ও কেরলে এর পরিমাণ অন্য জায়গার তুলনায় বেশি কিন্তু এই দুটি স্থানেই কলা ছাড়া অন্য ফল বিশেষ খাওয়া হয় না। কলাতে শর্করা অনেক বেশি পরিমাণে থাকে (শতকরা প্রায় 27 ভাগ), ফলে খাদ্যে শ্বেতসারের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। এতে সামান্য পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ 'সি' পাওয়া যায় (প্রতি শ' গ্রামে মাত্র 7 মিলিগ্রাম অর্থাৎ দুটো কলাই যথেষ্ট ঐ পরিমাণ 'সি' খাদ্যপ্রাণের জন্য)। আমের সময়ে সারা দেশে আম খাওয়া হয়। তার ফলে খাদ্যে 'এ' খাদ্যপ্রাণ যতটা দরকার প্রায় ততটাই পাওয়া যায়। এতে প্রতি এক শ' গ্রামে তিন হাজার মাইক্রো-গ্রাম 'এ' খাদ্যপ্রাণ থাকে, অর্থাৎ একটা আমে, কমবেশি দশ হাজার

মাইকোগ্রাম, 'এ' খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়। কমলালেবু ও মৌসম্বি খেলে যথেষ্ট পরিমাণে 'সি' খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়।

সাধারণত ফলের দাম বেশি। খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থ পেতে হলে তাই ফলের বদলে টাটকা শাক-পাতা খাওয়াই ভাল। প্রতিদিন 110 গ্রাম পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থ খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গুজরাট, কেরল ও কলিকাতার অধিবাসীদের খাদ্যে এর পরিমাণ নগণ্য আর নগণ্য না হলেও পাঞ্জাবের অধিবাসীদের খাদ্যে এর পরিমাণ যৎসামান্য থাকে। পাঞ্জাবের অধিবাসীদের সরষেশাক, পালংশাক প্রিয় খাদ্য, সে কারণে তারা মাত্র 44 গ্রাম পরিমাণ এইসব প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থ এ থেকে পায়। মধ্যপ্রদেশে এর পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বেশি।

এইসব থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই টাটকা ফল, কাঁচা শাকসব্জী ও দুধজাতীয় খাদ্যের অভাব।

প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্পতার অনুমান

খাদ্যে কয়েকটি পৌষ্টিক উপাদান কতটা থাকে তার একটা অনুমান পরিসংখ্যান করা হয়েছে, তা থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের খাদ্যে কতটা পৌষ্টিক উপাদানের অভাব থাকে, তারও একটা আনুমানিক হিসাব করা যায়।

ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানের খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণের পার্থক্য খুব বেশি। গুজরাটে দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায় 1880 মাত্রা, মহারাষ্ট্রে 1600 মাত্রা, কলিকাতায় 1420 মাত্রা, পাঞ্জাবে 2830 মাত্রা, কেরলে 1690 মাত্রা আর তামিল নাড়ুতে 1750 মাত্রায় ক্যালরি থাকে। কিন্তু যদি ভারতবর্ষের জনসংখ্যাকে বয়স, স্ত্রী ও পুরুষের আপেক্ষিক সংখ্যা, আমিষ ও নিরামিষ ভোজী অনুযায়ী বিভক্ত করি তা হলে দেখা যাবে যে, যে কয়েকটি প্রদেশে সমমান গড় (weighted average) 2124

ক্যালরির ন্যূনতম প্রয়োজন অনুপাতে এক-তৃতীয়াংশ কম পড়ে। এই গড়পড়তা হিসাব যদি ঠিক হয় তা হলে একথা বলা অন্যায় হবে না যে বহু ব্যক্তি প্রয়োজনের মাত্র অর্ধেক পৌষ্টিক উপাদান আহার করে।

প্রোটিনের পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার। দৈনিক গড় হিসাবে গুজরাটে 54 গ্রাম, মহারাষ্ট্রে 42 গ্রাম, কলিকাতায় 45 গ্রাম ও পাঞ্জাবে 84 গ্রাম, কেরলে 46 গ্রাম ও তামিল নাড়ুতে 52 গ্রাম প্রোটিন এখানকার অধিবাসীরা আহার করেন। এই হিসাবের ভিত্তিতে সারা ভারতে প্রোটিনের গড়পড়তা ব্যবহার আনুমানিক 46.3 গ্রাম। এ থেকে বলা যায় প্রোটিনের ব্যবহার প্রয়োজন অনুপাতে সন্তোষজনক। শুধু পরিমাণ নয় প্রোটিনের গুণেরও গুরুত্ব আছে। ভারতীয় খাদ্যে অধিকাংশ প্রোটিন প্রায় 70 শতাংশ শস্য-খাদ্য ও ডাল যোগায়। অল্পমাত্র প্রোটিন, জৈবখাদ্য যেমন দুধ, ডিম, মাংস থেকে আসে। প্রোটিন যা সাধারণত খাওয়া হয় তার জৈবিক মান মাত্র 60 যখন আমিষ-জাতীয় প্রোটিনের মান 80 থেকে 90। কেবলমাত্র কেরলে দৈনিক গড়ে 100 গ্রাম মাছ খাওয়া হয় আর পাঞ্জাবের অধিবাসী গড়ে 300 গ্রাম দুধ পান করে। কেবলমাত্র এই দুই প্রদেশে প্রোটিনের মান উচ্চ। এখানে মাত্রায় অল্প হলেও মোটামুটি প্রোটিনের পরিমাণ সন্তোষ-জনক। আর অন্যান্য প্রদেশে নিরামিষ প্রোটিনের শক্তি বাড়াবার জন্য উৎকৃষ্ট মানেরও অধিক পরিমাণের প্রোটিন-জাত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। কয়েকটি বিশেষক্ষেত্রে যেমন মায়ের দুধ খাওয়া ছেড়েছে এমন শিশু, স্তন্যদাত্রী ও গর্ভবতী মায়ের অধিক মাত্রায় প্রোটিন দরকার, অথচ তারাই প্রয়োজন অনুপাতে কম প্রোটিন পায়। এ ছাড়া যখন মোট ক্যালরি, প্রয়োজন অনুপাতে কম খাওয়া হয়, প্রোটিন ক্যালরির কাজ - দেহের তাপ রক্ষা করায় কাজে ব্যয় হয়, ফলে নিজের পুষ্টির সহায়তা করার কাজ করতে পারে না।

আমরা দেখেছি মাত্র 17 থেকে 22 গ্রাম স্নেহ-পদার্থ আমাদের

প্রতিদিনের খাদ্যে থাকে। দুধ, সজীবীজ, বাদাম ও প্রায় সবরকম খাদ্য যা আমরা আহার করি (ভাত, আটা, ডাল, সজী, মাংস, মাছ ও ডিম প্রভৃতি) তাতে যে স্নেহ-পদার্থ পরোক্ষভাবে থাকে তা এর সঙ্গে যোগ করতে হবে। দৈনিক এই পরোক্ষভাবে পাওয়া স্নেহ-পদার্থ প্রায় 8 থেকে 10 গ্রাম হয় তার সঙ্গে সোজাসুজি যে স্নেহ-পদার্থ পাই তার পরিমাণ যোগ করলে মোট দৈনিক 25 থেকে 30 গ্রাম স্নেহ-পদার্থ হয়। এই পরিমাণও প্রয়োজনের এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ কম পড়ে। খুবই স্বাভাবিক যে অল্প আয়ের ব্যক্তিরা এই দামী খাদ্যসামগ্রী কিনতে পারেন না ফলে এ রকম একটা মুখ্য পৌষ্টিক উপাদানের যৎসামান্য ভগ্নাংশ থেকেও তারা বঞ্চিত হন।

কয়েকটি ক্ষেত্রে, আমাদের খাদ্যে 'এ' খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ হিসাব করে দেখা হয়েছে। ধরা যাক্ কলিকাতা। আমাদের দৈনিক 'এ' খাদ্যপ্রাণের প্রয়োজন যেখানে 750 মাইক্রোগ্রাম, সেখানে এ সব অঞ্চলের অধিবাসীরা পান মাত্র 650 মাইক্রোগ্রাম। এই পরিমাণ অবশ্য খুব সন্তোষজনক নয় বলা যায় না। কিন্তু ছোট ছেলে মেয়েদের যাদের দেহের উচ্চতা ও ওজন এই খাদ্যপ্রাণের উপর নির্ভর করে, তাদের খাদ্যে এই খাদ্যপ্রাণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর অভাবে ছেলে-মেয়েদের দৃষ্টিশক্তি কমে যায় এমন কি শেষ পর্যন্ত তাদের অন্ধ হওয়ারও ভয় থাকে, কাজেই খাদ্যে 'এ' খাদ্যপ্রাণের স্বল্পতা আদৌ অবহেলা করা যায় না।

কলিকাতা শহরে একটি খাদ্যসমীক্ষায় চুন ও লৌহ এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজপদার্থ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। প্রতিদিনের খাদ্যে 600 মিলিগ্রাম পরিমাণ চুন থাকা প্রয়োজন। সমীক্ষায় দেখা গেছে খাদ্যে 523 মিলিগ্রাম মতো এই খনিজপদার্থ থাকে ; এ পরিমাণ সন্তোষজনক বলা চলে। কলিকাতার অধিবাসীরা বেশি পরিমাণে মাছ খান (মাছের নরম কাঁটা চুন খনিজপদার্থে ভরপুর

থাকে), ফলে তাঁদের খাদ্যে এই পরিমাণে চুন এসে যায়। কেরলের লোকেরা কলিকাতার লোকদের তুলনায় বেশি মাছ খান, ফলে তাঁদের খাদ্যে এই চুন উপযুক্ত পরিমাণে থাকে। কিন্তু গুজরাটের অধিবাসীরা যে সামান্য পরিমাণ দুধ খান তা তাদের চুন পাবার একমাত্র উৎস ; ফলে গড়ে তারা মাত্র 250-300 মিলিগ্রাম চুন পান, যা প্রয়োজনের বেশ কম বলা যেতে পারে। সংগৃহীত খাদ্যতথ্য থেকে এটা ঠিক বোঝা যায় না যে পানের সঙ্গে যে চুন খাওয়া হয় তাও হিসাবে ধরা হয়েছে কিনা। এ চুন শরীর গ্রহণ করে, ব্যবহার করে, কাজেই হিসাবে এই চুনকেও ধরা উচিত। দৈনিক সর্বনিম্ন মাত্রা, 300 মিলিগ্রাম চুনের কম বেশি হলেও এ থেকে পৌষ্টিক উপাদানের কোন তারতম্য হয় না। কিন্তু শিশুদের বিশেষ করে অল্প বয়সের শিশুদের এই 'শ্বেত' খনিজপদার্থের প্রয়োজন একটু বেশি মাত্রায় থাকে। মায়ের দুধ, গরু প্রভৃতির পশুর দুধ, রাগী দিয়ে প্রস্তুত পরিজ অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত শিশুখাদ্য থেকে শিশুরা এই চুন পায়। গর্ভবতী স্ত্রী ও যাদের স্তন্যপায়ী শিশু থাকে তাদের বেশি মাত্রায় চুনের খাবার প্রয়োজন হয়।

কলিকাতার লোকেরা গড়ে প্রতিদিন 27 মিলিগ্রাম করে খনিজ-পদার্থ লৌহ খায়। এটাই খনিজপদার্থের সঠিক পরিমাণ। কিন্তু অল্প বয়সীদের এর অভাব একটু বেশি, যেমন তিন বৎসর বয়স্ক শিশুদের এই খনিজপদার্থ প্রায় প্রয়োজনের অর্ধেকের উপর কম পড়ে। এই 'লোহিত' খনিজপদার্থ রক্ত উৎপাদনের জন্য বিশেষ দরকার, কিন্তু শিশুরা কেবলমাত্র দুধের উপর থাকে, আর দুধে এই খনিজপদার্থ থাকে না বললেও চলে সুতরাং কেবলমাত্র খাবারের উপর নির্ভর করা চলে না, পরিপূরক হিসাবে অতিরিক্ত লৌহ ওদের খাওয়ানো দরকার হয়। গর্ভবতী নারীদের এই লৌহের চাহিদা খুব বেশি, যদিও সবুজ শাক-সব্জী তারা খায় আর এ সব শাক-সব্জী লৌহতে ভরপুর, তবুও গর্ভাবস্থার চাহিদা মেটাতে এ পরিমাণ যথেষ্ট নয়। লৌহের অভাবে রক্তে

হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়, যা শেষ পর্যন্ত ফ্যাকাশে ভাব ও রক্ত-স্বল্পতা অবস্থায় দাঁড়ায়। এসব ক্ষেত্রে লৌহমিশ্রিত ঔষধের বড়ি খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

আরও কয়েকপ্রকার খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থ সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়। ডাল, মটরশুঁটি, গম-ভাঙানো আটাতে থায়ামিন (খাদ্যপ্রাণ বি$_1$) থাকে। কিন্তু সিদ্ধ করার পর সে জল ফেলে দিলে এর অধিকাংশ নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘাটতির মাত্রা বাড়বার আশঙ্কা থাকে যখন মাত্র একরকম শস্যখাদ্য, যেমন কলেছাঁটা সিদ্ধ চালের ভাত খাওয়া হয় ও তার সঙ্গে অন্য শস্যখাদ্য, যেমন গমভাঙানো আটা খাওয়া হয় না অথবা ডাল কম খাওয়া হয়। সাধারণ বিশ্বাস যে আগের মতো আমাদের খাদ্যে আর তত বেশি থায়ামিনের অভাব নেই; যেমন উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশে এখন এক প্রকারের খাদ্য গ্রহণ না কোরে সেখানকার অধিবাসীরা কয়েক-প্রকারের খাদ্য মিলিয়ে মিশিয়ে আহার করায় তাদের থায়ামিনের অভাব দেখা যায় না। আধুনিকতার এটা একটা মস্ত লাভ।

'রিবোফ্লেভিন' অথবা খাদ্যপ্রাণ বি$_2$-র অভাব প্রায় ভারতীয় খাদ্যে দেখা যায়, কারণ খাবারের সঙ্গে দুধ, ডিম, মাংস ও টাটকা শাক-সব্জী প্রায়ই থাকে না। একমাত্র ডালই এই খাদ্যপ্রাণ যোগায়। মাছে এত কম পরিমাণ এই খাদ্যপ্রাণ থাকে যা না থাকারই সমান।

'বি'-গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণের অন্যতম নিয়াসিন গোটা শস্যখাদ্যে, যেমন গমভাঙানো আটা ও ডালে, পাওয়া যায় কিন্তু চিনাবাদামে এর পরিমাণ অধিক থাকে। খাদ্য-প্রোটিনের একটি উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড, যাকে ট্রিপটোফ্যান বলা হয়, খাদ্যে তার পরিমাণের উপর নিয়াসিনের পরিমাণ নির্ভর করে, কারণ শরীরের মধ্যে ট্রিপটোফ্যান নিয়াসিনে রূপান্তরিত হয়। ডাল ও প্রায় সব বাদামে নিয়াসিন থাকে। কি প্রকার শস্যখাদ্য আহার করা হয় তা থেকে, নিকৃষ্টমানের খাদ্যেও

নিয়াসিনের পরিমাণ পর্যাপ্ত আছে কিনা, অনুমান করা যায়। যেখানকার প্রধান শস্যখাদ্য ছোলা অথবা অত্যধিক ছাঁটা চাল সেখানে এর অভাব হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ ছোলা প্রভৃতিতে ট্রিপটোফ্যান থাকলেও সামান্যই থাকে। গমভাঙানো আটায় এ রকম সম্ভাবনা কম।

খাদ্যপ্রাণ 'সি' সহজেই নষ্ট হয়ে যায় বলে এটা সুনিশ্চিত যে ভারতীয় খাদ্যে এর অভাব থাকে। এই অভাব দূর করার জন্য ফল ও যে সব সব্জী কাঁচা খাওয়া যায়, তা খাওয়া উচিত। এর অভাব পূর্ণ করার আর একটি সহজ উপায় কল-বেরুনো ডাল খাওয়া, কারণ কলে ও দানায় দুটোতেই প্রচুর পরিমাণে 'সি' খাদ্যপ্রাণ জন্মায়।

আয় ও খাদ্য

আমাদের খাদ্যে পৌষ্টিক উপাদানের এত অভাব কেন? নিঃসন্দেহে বলা যায় ভালো খাদ্য পাবার প্রধান বাধা অল্প আয়। ধনী লোকেরা হয়তো না জেনে ত্রুটিপূর্ণভাবে খাদ্যগ্রহণ করে। কিন্তু একটা বেশি আয়ের স্তর পর্যন্ত, খাদ্যের গুণাগুণ নির্ভর করে, সংসারের আয়ের উপর।

তাছাড়া নিম্ন আয়ের লোকেদের, তাদের সামান্য আয়ের বেশির ভাগই খাবার জিনিস কিনতে খরচ হয়। কলিকাতায় সংগৃহীত সমীক্ষা তথ্য থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে নিম্নতম আয়ের 10 শতাংশ লোক তাদের সামান্য আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ খাদ্যসামগ্রী কিনতে খরচ করে, আর সে তুলনায় উচ্চতম আয়ের 20 শতাংশ লোক তাদের অধিক আয়ের মাত্র 40 শতাংশ খাদ্যসামগ্রীতে খরচ করে।

খাদ্যের ধরনেরও অনেক পার্থক্য। নিম্নতম আয়ের লোকদের আয়ের অর্ধেক অর্থাৎ মাথা পিছু 10 টাকা খরচ হয় খাদ্যশস্য কিনতে আর মাত্র 4 শতাংশ যা মাত্র দাঁড়ায় মাসে এক টাকা তা খরচ হয় দুধ কিনতে। উচ্চতম আয়ের লোকেরা সে ক্ষেত্রে মাত্র তাদের আয়ের 17 শতাংশ মাত্র খাদ্যশস্যে আর 10 শতাংশ দুধের জন্য ব্যয় করে। অবশ্য

দ্বিতীয় উদাহরণে মোট টাকার পরিমাণও অনেক বেশি ; যেমন মাসে এরা মাথা পিছু 13.50 খাদ্যশস্যের জন্য, 10.50 টাকা দুধ কিনতে ব্যয় করে। নিম্নতমের আয়ের তুলনায় উচ্চতম আয়ের লোকদের খাদ্যশস্যের জন্য খরচ খুব একটা বেশি নয় কিন্তু দুধের খরচ ওদের দশ গুণ বেশি।

আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের মানের উন্নতি হবে তা বলা চলে না। পৌষ্টিক খাদ্য না কিনে অনেক সময় সেই টাকা খরচ করা হয় মোড়ক করা খাবার অথবা বোতলে সংরক্ষিত খাবার ও পানীয় কিনতে কারণ এতে সামাজিক মান বাড়ে। আরও ভালো জ্ঞান ও শিক্ষা লোকের এরূপ মনোভাব সংশোধন করতে পারে, অবশ্য কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা শক্ত।

কারা বেশি ভুক্তভোগী

দারিদ্র্যজনিত নিম্নমানের পৌষ্টিক উপাদান আহার করে পরিবারের কারা বেশি ভোগে ? খাদ্যের ধরন সমীক্ষা করে জানা যায় যে যেটুকু ভালো খাবার তা পরিবারের পূর্ণবয়স্ক পুরুষরা পান। আর পরিবারের অন্যলোকেরা ও বিশেষ করে মেয়েরা—এমন কি যখন তারা গর্ভবতী থাকে অথবা শিশুকে স্তন্যদান করে, তখনও গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে কম খাবার পান। 6 থেকে 15 বৎসর বয়স্ক ছেলে-মেয়েরা, এমন কি তার চেয়ে অল্পবয়সী শিশুরাও স্বচ্ছল পরিবারের সমপর্যায়ের স্ত্রী-লোক, অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে ও শিশুদের তুলনায় অল্পই পুষ্টিকর খাদ্য পায়। গৃহিণী দেখেন যতটা সম্ভব ভালো খাবার পরিবারের যিনি অন্ন-সংস্থান করছেন তিনি যেন পান। অনেক সময় নিজেকে ও শিশুদের বঞ্চিত করে গৃহিণীকে এ কাজ করতে হয়। তাই তাঁরা পুরুষদের খাওয়ার পর আহার করেন। পরিবারে যেটুকু খাদ্যের সংস্থান হয় তার এরকম অসম বণ্টনের ফল দাঁড়ায় যে যাদের শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের বিশেষ দরকার তারাই থেকে যায় পুষ্টিহীন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খাওয়ার পর খাদ্যের কি পরিণাম হয়

খাবার সময় প্রথমে আমরা খাদ্যবস্তু মুখে পুরি ; সে খাবার শক্ত হলে তা চিবাই ও তরল হলে তা গিলে ফেলি, তারপর সে খাবার গলা দিয়ে নেমে যায়। এর পর সে খাদ্যবস্তুর কি হয় ? সেই পরিপাক-ক্রিয়ার আশ্চর্যজনক কাহিনী এখন আমরা আলোচনা করব। তাতে খাবার সময়কার ভালো অভ্যাসগুলি মেনে চলার প্রয়োজন সঠিক বোঝা যাবে।

মুখের মধ্যে খাদ্যের কি পরিণাম হয় ?

খাবার চিবালে তা ছোট-ছোট টুকরো হয়ে মুখের লালার সঙ্গে মিশে যায়। আমাদের মুখে সর্বদা যে তরল পদার্থ থাকে তাকে লালা বলে। মনে হতে পারে লালা জল ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু ত: ঠিক নয়। এই লালায় অদৃশ্য এনজাইম থাকে যা খাবারকে হজম করায়। লালার এই এনজাইম অদ্রাব্য মণ্ড-শর্করাকে 'জলে গলে' এমন পদার্থে পরিণত করে।

পরিপাক-ক্রিয়া বলতে সোজাসুজি এই বুঝায়—নানাপ্রকার এনজাইন কিভাবে খাদ্যবস্তুকে সরল পদার্থে পরিণত করে যাতে শরীর তা গ্রহণ করে প্রয়োজনে লাগাতে পারে। দেহের বিভিন্ন যন্ত্র থেকে

এই সব এনজাইম ক্ষরিত হয় ও খাদ্যবস্তুকে হজম করাবার কাজে লাগে। অপাচ্য যা শেষে পড়ে থাকে তা মল হয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। এই পরিপাক-ক্রিয়া কিভাবে কাজ করে তা অনুসন্ধান করা যাক।

যখন আমরা আহার করতে শুরু করি এমন কি যদি খাবারের গন্ধ শুধু আমাদের নাকে আসে তখন আমাদের মুখে জল আসে। তিন-জোড়া লালাগ্রন্থী থেকে ক্ষরিত হয়ে লালা আমাদের মুখে আসে। দু কানের নিচে ও সামনে একজোড়া, নিচের চোয়ালের ও পিছনের দিকে দ্বিতীয় জোড়া ও তৃতীয় জোড়া লালাগ্রন্থী আমাদের জিভের নীচে থাকে। ধারণা করতে পারেন, এই লালা থেকে দিনে দশ কাপ লালা ক্ষরিত হয়। আগেই বলা হয়েছে লালায় যে এনজাইম থাকে তা অদ্রাব্য শ্বেতসারকে সহজ-দ্রাব্য শর্করাতে পরিণত করে। চিবালে খাদ্য ছোট-ছোট অংশে ভেঙ্গে যায় এবং খাদ্যকণা যত ছোট হবে লালার কাজ ততই সহজ হয়। মজা করে বলা হয় প্রতিটি গ্রাসে বত্রিশবার চিবিয়ে খাওয়া উচিত অর্থাৎ দাঁত পিছু একবার।

খাবার এবার গলা অর্থাৎ গ্রাসনালী দিয়ে নিচে নেমে যায়। আমাদের গলায়, 'এপিগ্লটিস' নামে একটি নমনীয় ঢাকনার মতো আছে। আমরা যখন খাবার গিলি তখন 'এপিগ্লিটিস' শ্বাসনালীর মুখ ঢেকে দেয় যাতে খাদ্যবস্তু ভুল পথে অর্থাৎ শ্বাসনালীতে চলে না যায়। কারণ এ দুটো নালীই পাশাপাশি থাকে। কখনো যদি 'এপিগ্লটিস' তাড়াতাড়ি বন্ধ না হওয়ায় খাবারের টুকরো কিংবা এক ফোঁটা জল আমাদের শ্বাসনালীতে ঢুকে যায়, আমরা অস্বস্তিবোধ করি। আমাদের বিষম লাগে, কাশি হয় ও চোখ জলে ভরে যায়।

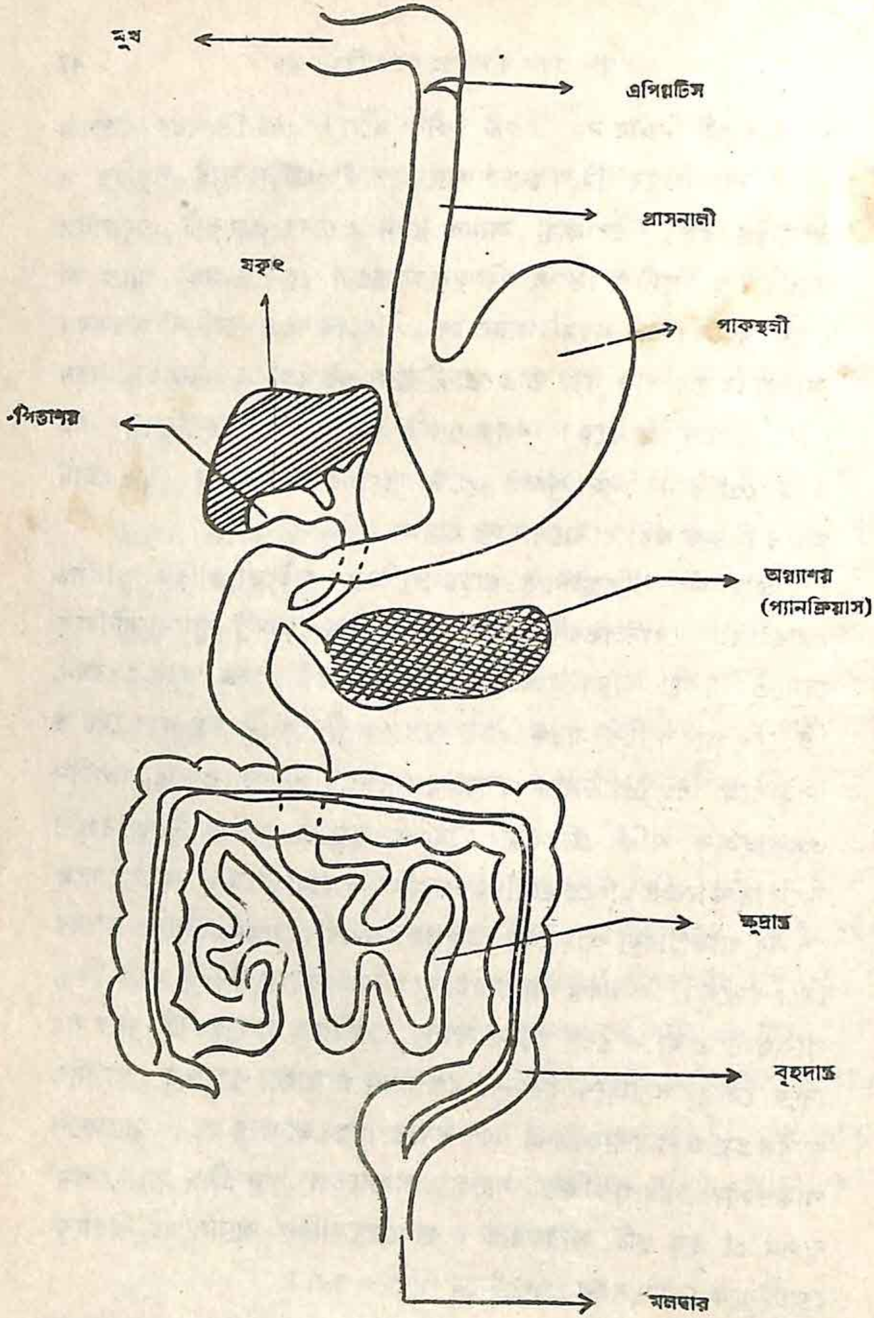
পাকস্থলী

গিলে ফেলার পর খাবার গ্রাসনালী দিয়ে পাকস্থলীতে পৌঁছায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পাকস্থলী দেখতে একটি ফলের মতো।

তা বলে এটি নির্জীব নয়. একটি সজীব থলে। এর ভিতরের খাদ্যবস্তু যাতে ভালোভাবে মিশে যেতে পারে তাই এটি সর্বদাই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। এর মধ্যে আমরা নতুন ধরনের কয়েকটি এনজাইম পাই। পাকস্থলীর ভিতর দিকের আস্তরণে যে সব গ্রন্থী থাকে তা থেকে এই সব এনজাইম ক্ষরিত হয়। এদের মধ্যে 'রেনিন' অন্যতম। আমরা যে দুধ পান করি তার প্রোটিনকে এই রেনিন এনজাইম, নরম দইয়ে রূপান্তরিত করে। আর একটি এনজাইম হল পেপসিন। এর কাজ প্রোটিনের লম্বা শৃঙ্খল ভেঙে, 'পেপটোন' নামক ছোট-ছোট অংশে বিভক্ত করা যা জলে গলে যায়।

আমাদের পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি হয়। বোতলভরতি এই একই অ্যাসিড কেমিস্ট্রি ল্যাবোরেটরিতে দেখতে পাওয়া যায়। এই অ্যাসিড কয়েকটি কাজ করে ঃ যেমন, ভিতরের পারস্পরিক সম্বন্ধ ঢিলে করে প্রোটিনকে নিস্তেজ করে দেয় ও সেই সঙ্গে এই প্রোটিনকে ভেঙে পেপটোনে পরিণত করতে পেপসিন এনজাইমকে শক্তি জোগায়। বিভিন্ন খাদ্যের খনিজ উপাদানগুলি গলাবার কাজেও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সাহায্য করে। খাদ্যের সঙ্গে যে সব ব্যাকটিরিয়া আমাদের পাকস্থলীতে পৌঁছায় এই অ্যাসিড তাদের মেরে ফেলে। খাদ্যবস্তু আমাদের মুখে মাত্র কয়েক মিনিট থাকে কিন্তু পাকস্থলীতে থাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা। খাওয়ার প্রায় দু ঘণ্টা পরে সব চেয়ে বেশি পরিমাণে রেনিন. পেপসিন ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষরিত হয় ও পরিপাকক্রিয়া এই সময়ে খুব জোরদার হয়। সংক্ষেপে পাকস্থলীর পরিপাকক্রিয়া যাকে ডাক্তারেরা 'গ্যাসটিক ডাইজেশন' বলেন তা হল দুটি জারকরস ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে প্রোটিনকে ভেঙে সরল পেপটোনে পরিণত করা।

কিছুক্ষণ পরপর আমাদের পাকস্থলীর শেষের দিকের বেরোবার পথের অর্গল খুলে যায়। সামান্য অথবা আংশিক হজম হওয়া খাদ্যবস্তু


মুখ
এপিগ্লটিস
গ্রাসনালী
যকৃৎ
পাকস্থলী
পিত্তাশয়
অগ্ন্যাশয়
(প্যানক্রিয়াস)
ক্ষুদ্রান্ত্র
বৃহদান্ত্র
মলদ্বার

পরিপাক ক্রিয়া

যা এখন নরম কাই অথবা তরল অবস্থায় পরিণত হয়েছে তা এই খোলা পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়। খাদ্যবস্তু বেরিয়ে যাবার পর পাকস্থলীর অর্গল নিজের থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের শরীরে যে সব আশ্চর্যজনক ক্রিয়া ঘটে এটি তো তার মধ্যে একটি। যেহেতু খাদ্য পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ থাকে এবং অল্প পরিমাণে বার হয়, তাই আমাদের দিনে তিন-চারবার খাবার খেলেই চলে। যদি সমস্ত খাদ্যবস্তু পাকস্থলী থেকে একবারে বেরিয়ে যেত তা হলে আমাদের সারাদিনই ক্ষুধার তাড়না সহ্য করতে হত।

ক্ষুদ্রান্ত্র

আংশিক হজম হওয়া কাই-এর মত খাদ্যবস্তু পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরের অংশকে গ্রহণী (duodenum) বলা হয়। গ্রহণী প্রায় একফুট লম্বা ও ক্ষুদ্রান্ত্রের বাকী অংশ অপেক্ষা চওড়া। গ্রহণীতে একটি টিউবের ভিতর দিয়ে পরবর্তী এনজাইম চুঁইয়ে পড়ে। এই এনজাইমটি, দুটি জিনিসের মিশ্রণ, একটি তিক্ত পিত্তরস যা যকৃতে তৈরি হয়, অন্যটি অগ্ন্যাশয় (pancreas বা sweetbread বলে) থেকে আসে। আকারে আমাদের হাতের তালুর মতো অগ্ন্যাশয়-যন্ত্রটি পাকস্থলী ও অন্ত্রের মাঝখানে থাকে। আগের চিত্রটি দেখলে এই যন্ত্রটি শরীরে কোথায় থাকে তা সঠিকভাবে বোঝা যাবে। তৃতীয় পদার্থ টিও হজমের সহায়তা করে। এটি অন্ত্রের রস, সারা পথে মাঝে মাঝে অন্ত্রের মধ্যে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। শুনলে অবাক লাগে যে ক্ষুদ্রান্ত্র সরু হলেও খুব লম্বা, মানুষের উচ্চতার পাঁচ কি ছয়-গুণ হবে, এটিকে পরিপাটি করে ভাঁজ করে নাভির পিছনে রাখা আছে। এই লম্বা ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যেই অধিকাংশ খাদ্য হজম হয়।

আমাদের পরিপাকের কাজটি বেশ জটিল। অগ্ন্যাশয়-রসে অনেক-গুলি এনজাইম ছাড়াও অন্য শক্তিবর্ধক বস্তু থাকে যাকে 'হরমোন' বলা

হয়। এই সমস্ত জারকরস একসঙ্গে কাজ করে, প্রোটিন থেকে পাওয়া পেপটোনকে আলাদা আলাদা অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে। অগ্ন্যাশয়-রস শ্বেতসার ও স্নেহপদার্থকে হজম করায়। মণ্ডশর্করার ন্যায় শ্বেতসার, শেষ পর্যন্ত এই অগ্ন্যাশয়-রসের দ্বারা দ্রাব্য-গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং ল্যাকটোজ (দুধে থাকে) ও গ্লুকোজে পরিণত হয়। স্নেহপদার্থকে পরিপাক করে একটি সরল বস্তুতে পরিণত করে এবং এছাড়াও এই কাজে আর একটি পদার্থের প্রয়োজন হয় যা যকৃৎ-এ হয়। যকৃৎ হল মনুষ্যশরীরে রসায়ন-বিজ্ঞানাগার। ইংরেজিতে একটি প্রশ্ন করা হয় যার উত্তরটি দ্ব্যর্থবাচক। প্রশ্নটি হল what is life অর্থাৎ জীবন কি ? উত্তরে বলা হয়েছে it depends upon the liver। অর্থাৎ জীবন liverএর উপর নির্ভর করে। 'লিভার' কথাটির দুটি অর্থ হয়, একটি যকৃৎ, অন্যটি যে ব্যক্তি জীবনযাপন করছে। দুটি অর্থের যে-কোন একটি নিলেও বাক্যটি অর্থবহ হয়। হৃৎপিণ্ড থেকে যকৃতে রক্ত আসে। রক্তে শর্করার পরিমাণ এবং পেশীতে এই শর্করার সঞ্চয় এই দুটি কাজই যকৃৎ নিয়ন্ত্রণ করে। যকৃৎ রক্ত থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড সংগ্রহ করে তাকে প্রোটিনে পরিবর্তিত করে। যকৃতে সঞ্চিত এই প্রোটিন অন্য কোন অঙ্গের প্রয়োজন হলেই রক্তের সঙ্গে মিশে সেখানকার কাজে লাগে। যকৃৎ অনেক বিষাক্ত জিনিস নষ্ট করে এবং অনেক খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থ সঞ্চিত রাখে।

যকৃতে যা যা তৈরি হয় তার মধ্যে পিত্ত অন্যতম। পিত্ত সবুজ রং-এর একটি তিক্ত রস। এতে কোন এনজাইম থাকে না কিন্তু অনেকগুলি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য থাকে, যার কাজ খাদ্যকে অতি সূক্ষ্ম অংশে রূপান্তরিত করা, যাকে 'অবদ্রব' (emulsion) বলে। সাধারণ দুধ এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। খাদ্যবস্তু অবদ্রবে পরিণত হলে এনজাইম তা হজম করাতে পারে। ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের সঠিক পরিপাকের জন্য, বিশেষ করে স্নেহপদার্থের, পিত্তের দ্বারা অবদ্রবে পরিবর্তিত,

হওয়া একান্ত দরকার।

এই রকম দ্রাব্য সরল পদার্থে পরিণত হওয়ার পর আমাদের খাদ্য কি ভাবে হজম হয়? এই খাদ্যকে শরীরে শোষণ করাতে হয় এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে এ কাজ সম্পন্ন হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের আস্তরণে, হাতের আঙুলের মতো দেখতে ছোট-ছোট অনেকগুলি জিনিস বেরিয়ে আছে, এদের ইংরেজিতে 'ভিল্লি' (villi) বলে। এরাই শোষণযন্ত্র। এরা পরিপাক করা খাদ্যবস্তুকে রক্তে সঞ্চারিত করে। রক্ত তার বহন-প্রণালীর দ্বারা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে এসব পৌঁছে দেয়। শোষিত স্নেহপদার্থের কিছুটা. লিমফেটিক (lymphatic) নামক অন্য এক প্রণালীর দ্বারাও সঞ্চালিত হয়ে সাধারণত ঘাড়ের কোন এক জায়গায় রক্তের সঙ্গে এসব মিশে যায়। আমাদের ভুক্তদ্রব্য এভাবে রক্তে গিয়ে মেশে ও তার মাধ্যমে সর্বশরীরে তা ছড়িয়ে পড়ে, শরীরে শক্তি যোগায়, শরীর গড়ে তোলে ও শারীরিক ক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করে।

খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থ বেশির ভাগই জলে গলে যায়। না গললেও সহজেই রক্তে সঞ্চারিত হবার মত পদার্থে পরিণত হয়। শুধু খাদ্যপ্রাণ 'এ' ব্যতিক্রম, এ কেবল স্নেহপদার্থে গলে। এটিও স্নেহ-পদার্থের মতই ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয়। পরিপাকের সময় খাদ্যপ্রাণ ও খনিজপদার্থ ছোট-ছোট টুকরোতে পরিণত হয় না, এগুলি খাদ্যবস্তু থেকে পৃথক হওয়ার পর শোষিত হয় যখন অন্যান্য পৌষ্টিক উপাদান-গুলির পরিপাক চলতে থাকে।

বৃহদন্ত্র

ক্ষুদ্রান্ত্রের পর বৃহদন্ত্র। এটি মসৃণ অর্থাৎ এটিতে কোন খাঁজ নেই। বাইসাইকেলের চাকার মোটা টিউবের মতো দেখতে, যেমন এঁকে দেখানো হয়েছে। ইংরেজি অক্ষর 'U'কে উল্টো করলে যে রকম হয় সেভাবে বৃহদন্ত্র পেটের ভিতরে পাকস্থলীকে বেষ্টন করে আছে। এর

মধ্য দিয়ে হজম করা খাদ্য যখন যায় বৃহদন্ত্র তখন তার জলীয় অংশ শুষে নেয় যার ফলে খাদ্যবস্তুর তরলতা কমে তা শক্ত হয়ে আসে। হজম হওয়া খাদ্যবস্তুর মধ্যে কিছু কিছু ভেঙে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী এক পদার্থের সৃষ্টি করে। অপাচ্য খাদ্যদ্রব্য মলদ্বারে এসে পৌঁছায় ও মল হয়ে তা বেরিয়ে আসে।

ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হওয়ার পর তার পরিণতি কি হয়?

আমরা দেখেছি শ্বেতসার (মণ্ডশর্করা ও শর্করা) প্রথমে মুখের মধ্যে টুকরো-টুকরো হয় ও পরে ক্ষুদ্রান্ত্রে তা সাধারণ শর্করায় প্রধানত গ্লুকোজে বিভক্ত হয়। "ভিল্লি" এই গ্লুকোজ শুষে নিয়ে সোজা রক্তপ্রবাহে মিশিয়ে দেয়। এই ভাবে এই গ্লুকোজ আমাদের শরীরের সর্বত্র পৌঁছে যায়; এর অধিকাংশ, পেশী তাদের শক্তির উৎস হিসাবে কাজে লাগায়। গ্লুকোজের সামান্য অংশ গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত হয়, আর গ্লুকোজই গ্লাইকোজেন হয় দুই তৃতীয়াংশ পেশীতে, এক-তৃতীয়াংশ যকৃতে থাকে। কিছু গ্লুকোজ রক্তপ্রবাহে সবসময় থাকে আর এর মাত্রা কম-বেশি হয় না, একরকমই থাকে। এর মাত্রা বেড়ে যাওয়া মানে আমাদের পরিপাকক্রিয়ার কোথাও গোলযোগ হয়েছে। তার অন্যতম লক্ষণ হল বহুমূত্র রোগ।

স্নেহপদার্থ ভাঙতে ভাঙতে সরল পদার্থে ও শেষ পর্যন্ত "গ্লাইসিরোল" ও "ফ্যাটি অ্যাসিডে" পরিণত হয়। গ্লাইসিরোলের মতো ফ্যাটি অ্যাসিড-এর কিছু অংশ রক্তে এবং সেখান থেকে যকৃতে যায়। ফ্যাটি অ্যাসিড যকৃতে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয় অথবা উপযুক্ত নানা আকারে আবার রক্তের মধ্য দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর এই ফ্যাটি অ্যাসিডকে শক্তির উৎস হিসাবে কাজে লাগান হয় অথবা এ অ্যাসিড চর্বিতে পরিণত হয় যা চবিতন্তু হয়ে রক্তের মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য প্রেরিত হয়। স্নেহপদার্থের কিছুটা লিমফেটিক

পদ্ধতিতে শোষিত হয়ে অবশেষে আমাদের রক্তে মেশে। নানাপ্রকার দেহতন্তুতে থাকে এরূপ একটি এনজাইমের সাহায্যে এরূপ স্নেহপদার্থের কণাগুলি অল্পক্ষণের মধ্যে ভেঙে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়। এ কথা মনে রাখা ভালো যে আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করলে তার প্রায় সবটাই শরীরে চর্বি হয়ে জমা হয়। পরে যখন আমরা অল্পমাত্রায় আহার করি যেমন উপবাসের সময়, প্রথমেই এই জমানো চর্বি দেহরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়।

শেষে প্রোটিন তার মৌলিক উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড হয়ে রক্তে মেশে। শরীরের বিভিন্ন অংশে এই অ্যামিনো অ্যাসিড সঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। তন্তু-প্রোটিন এনজাইম, হরমোন ও এইরূপ অনেক রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ প্রোটিনজাতীয়। যকৃৎ দেহজ প্রোটিন তৈরি করে জমা রাখে ও অল্প অল্প করে তা রক্তে মিশিয়ে দেয়। অতিরিক্ত যা থাকে যকৃতে তা সরল পদার্থে রূপান্তরিত হয় ও শরীর এর কয়েকটিকে অন্য প্রকারে ব্যবহার করে।

অনেক প্রকার খনিজপদার্থ ও খাদ্যপ্রাণ যকৃতে জমা থাকে। প্রয়োজনে হাজার রকম পারস্পরিক যোগসূত্রের মাধ্যমে শরীরে সঞ্চারিত হয়। এই সমস্ত দৈহিক ক্রিয়াকলাপ আমাদের জীবনের স্পন্দন রক্ষা করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খাদ্যসংক্রান্ত প্রচলিত বিধিনিষেধ

প্রায় প্রতিটি কাজের মতোই আমরা চিরাচরিত প্রথা ও অভ্যাস অনুযায়ী আহার্য গ্রহণ করি। অবশ্য সর্বদা এটা খারাপ নয়। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখেছি যে সাধারণ ভারতীয় খাদ্য অর্থাৎ ভাত, রুটি, ডাল, তরিতরকারী, দই ও দুধে তৈরি মিষ্টির সঙ্গে যদি আমরা টাটকা শাকসজী ও পাকাফল যোগ করি তা হলেই আমরা চমৎকার সুষম-খাদ্য পাব। কিন্তু অনেক বছর ধরেই খাদ্যসম্বন্ধে কিছু অভ্যাস ও নিষেধ আমরা মেনে চলেছি, যা পুষ্টিবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের বর্জন করা উচিত। বিশেষ করে যখন এই বিধিনিষেধ, আমরা যে স্বল্প আহার পাই তার পৌষ্টিক মান আরও কমিয়ে দেয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যের যে সব বিধিনিষেধ মেনে চলা হয় তার কয়েকটি উদাহরণ এই পরিচ্ছেদে দেওয়া হল।

গরম ও ঠাণ্ডা খাদ্য

গরম ও ঠাণ্ডা খাদ্যের বিবরণ সম্বন্ধে ধারণা ভারতবর্ষে প্রচলিত। আয়ুর্বেদীয় ও য়ুনানী চিকিৎসাশাস্ত্র এই পদ্ধতি মেনে চলে। যেমন আমরা অনেকেই ছেলাবেলায় শুনেছি যে আম গরম ফল, কাজেই

পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ ছাড়া আম বেশি খাওয়া ভালো নয়। দুধ ঠাণ্ডা সেজন্য আম দুধ একসঙ্গে খেলে অপকার হয় না। দুধ ছাড়া বেশি আম খেলে ফোড়া হবার সম্ভাবনা, এই বলে আমাদের সাবধান করা হত। শুধু আমাদের দেশেই নয়, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা, ফিলিপাইন, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়ার আদিবাসীরাও খাদ্যের এই ঠাণ্ডা, গরম ভেদ মেনে চলে।

প্রচলিত বিশ্বাস হল শীত ও বর্ষার দিনে গরম খাদ্য গ্রহণ করা ভালো, কারণ তা শরীরকে শক্তি জোগায়। গরম খাদ্যের উদাহরণ হল গম, গুড়, মাংস, মাছ, ডিম, চা, কফি, আদা, নানারকমের মশলা, আম, পেঁপে ও কাঁঠাল। ভাত, দই, ঘোল ও বেশির ভাগ রসাল ফল ঠাণ্ডা খাদ্যের মধ্যে ধরা হয়। গরমের দিনে ঠাণ্ডা খাদ্য আহার করলে সুফল হয়।

কয়েকটি রোগেরও চিকিৎসা এই পদ্ধতিতে করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী পেটের অসুখে ঠাণ্ডা খাদ্য, যেমন ঘোল গ্রহণ করা ভালো তাতে দেহের উষ্ণতা কমায়। কাশি অথবা শ্বাসকষ্টে গরম খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। আবার, চর্মরোগ যা রক্ত দূষিত হলে, হয় বলে বিশ্বাস এবং চোখ-ওঠা প্রভৃতিতে গরম খাদ্য বর্জন করা বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়।

আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গরম ও ঠাণ্ডা খাদ্যের এই প্রভেদ সর্বদা বিজ্ঞানসম্মত বলে মানা হয় না। কিন্তু জনসাধারণের মনের এই বদ্ধমূল ধারণার পরিবর্তন করে খাদ্যসম্বন্ধীয় কতকগুলি ভালো অভ্যাস করানোতে অনেক অন্তরায় রয়েছে।

সুপাচ্য ও দুষ্পাচ্য খাদ্যসম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস

পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের সহজপাচ্য ও দুষ্পাচ্য খাদ্যসম্বন্ধে ধারণার অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে সাধারণের বিশ্বাস চাল সহজ-

পাচ্য ও গম দুষ্পাচ্য। কিন্তু গমকে চাল অপেক্ষা অধিক শক্তিদায়ক বলে ধরা হয়। সাধারণের ধারণা ডালের মধ্যে মুগ ডাল সর্বাপেক্ষা ভালো হজম হয় ও অতটা সহজপাচ্য না হলেও এর পরই স্থান অড়হর ডালের। সাধারণের ধারণা ঘি অন্যান্য স্নেহপদার্থ অপেক্ষা সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে হজম হয়। বাস্তবে কিন্তু ঘি, তেল ও অন্যান্য স্নেহজাতীয় খাদ্য হজম হতে একই সময় লাগে।

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে মহারাষ্ট্রে বেশির ভাগ লোকেরই ডিম, মাছ ও মাংস প্রভৃতি আমিষখাদ্যের শক্তিদায়ক গুণসম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা নেই, যদিও প্রায় পরিবারের দুই-তৃতীয়াংশ লোকই আমিষভোজী। কিন্তু এর পার্শ্ববর্তী প্রদেশ গুজরাট। সেখানকার বেশির ভাগ লোক নিরামিষভোজী হলেও তাদের ধারণা আমিষখাদ্য বেশি শক্তিদায়ক। কলিকাতার অধিবাসীদের খাদ্যসম্বন্ধে মনোভাবের অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে তাঁরা মনে করেন দুধ, মাছ ও মাংস বাড়ন্ত শিশুদের একান্ত প্রয়োজন। এখানে মোড়ক করা শিশুখাদ্য আমিষভোজীরা নিরামিষভোজীদের অপেক্ষা বেশি পছন্দ করেন। তার কারণ, সম্ভবত নিরামিষভোজীরা আশঙ্কা করেন যে এ-সব মোড়ক করা খাদ্যে হয়তো আমিষজাতীয় কিছু মেশানো আছে।

কতকগুলি প্রচলিত ভুল ধারণা

গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী স্ত্রীলোকের আহার্যসম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা দেশে প্রচলিত আছে। অথচ স্ত্রীলোকের এই দু সময়েই পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে গর্ভপাত হওয়ার ভয়ে গর্ভবতী মেয়েদের পেঁপে খেতে দেওয়া হয় না। এটা খুবই দুঃখের বিষয় কারণ পেঁপে দামে খুবই সস্তা এবং এতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ 'এ' পাওয়া যায় যা গর্ভাবস্থায় বিশেষ প্রয়েজেন। কাঁচাপেঁপের বীজ খেলে হয়তো গর্ভনাশ হতে পারে এই

ধারণা থেকেই পুষ্ট পাকাপেঁপে খাওয়া উচিত নয় এই বিশ্বাস জন্মেছে। খাদ্যপ্রাণ 'এ'র আর একটি উত্তম উৎস কুমড়ো। গরম খাদ্য বলে দক্ষিণ ভারতের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের কুমড়ো ও কাঁঠাল খেতে দেওয়া হয় না। কিন্তু মজার কথা যে কেরলে মাছ বেশি খাওয়া হয় বলে বিধিনিষেধের কোন গুরুত্ব এখানে নেই। এই সব বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কেবল কতকগুলি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য থেকে মায়েদের বঞ্চিত করা।

এক অঞ্চলে যে সব খাদ্য নিষিদ্ধ, অন্য অঞ্চলে সেই সব খাদ্যের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রচলিত বিধিনিষেধগুলি কত অবাস্তব। তামিল নাড়ুতে স্তন্যদাত্রী মায়েদের বিশেষ করে ভাত, দই, টাটকা শাক-সব্জী ও পান খেতে বলা হয়। (পানে চুন থাকে বলে তা থেকে ক্যালসিয়াম পাওয়া যাবে)। কিন্তু গুজরাটে স্তন্যদাত্রী মায়েদের ঠিক এই খাবারগুলিই খেতে নিষেধ করা হয়। ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে এই ভুল ধারণা আছে যে রশুন খেলে মায়েদের দুধ বাড়ে ও গর্ভনিরোধ করে।

ভারতবর্ষে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, গর্ভাবস্থায় মেয়েদের কম খাওয়া উচিত। আমরা দেখেছি যে গর্ভবতী মা ও গর্ভস্থ শিশু উভয়েরই উপযুক্ত পুষ্টির জন্য খাদ্যের মান ও মাত্রা দুই-ই বাড়ান দরকার। গর্ভাবস্থায় মায়েদের খাদ্যের পরিমাণ কমানোর মুখ্য কারণ যে ভারতীয় মায়েরা আকারে ছোট ও পুষ্টিহীন, উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য পেলে গর্ভস্থ শিশু যদি আকারে বড়ো হয়, সন্তানজন্ম খুবই কষ্টদায়ক হবে, এই ধারণা করে মায়েদের ভয়। গর্ভাবস্থায় কতকগুলি পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার ঐ একই কারণ।

আর একটি ভুল ধারণা, প্রসবের সময় ও পরে জলপান প্রসূতির পক্ষে বিপজ্জনক। কিন্তু এই সময়ে প্রসূতির শরীর থেকে প্রচুর তরল পদার্থ ঘাম ও রক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়। হয়তো আগের দিনে জল না ফুটিয়ে খাওয়ার ফলে প্রসূতি অসুস্থ হতেন সেটাই এই বিশ্বাসের মূল।

আজকালকার দিনে এই ভয় কত নিরর্থক তা আমরা জানি। প্রসূতিকে প্রসবের সময় ও পরে প্রচুর ফোটান জল পান করতে দেওয়া উচিত।

অজ্ঞাতসারে শিশুরাও অনেক সময়ে এই সব প্রচলিত বিধিনিষেধের শিকার হয়ে পড়ে। একটি বহু প্রচলিত ভুল ধারণা যে শিশুদের ডাল খাওয়া উচিত নয় কারণ ডাল থেকে পেটে গ্যাস হয়। সেজন্য মায়ের দুধ ছাড়াবার পর শিশুদের শুধু ভাত ও গমসিদ্ধ খেতে দেওয়া হয়। যার ফলে ভাল প্রোটিনের উৎস থেকে এরা বঞ্চিত হয়। কচি শিশুরা সুসিদ্ধ ডাল বেশি পরিমাণে খেতে পারে। বিশেষ করে মুগডাল একটু বেশি বয়সের শিশুরা সহজেই হজম করতে পারে। কল-বেরোবার পর আস্ত কিংবা রৌদ্রে কিছুটা শুকিয়ে, ভেজে অথবা গুঁড়ো করে ডাল শিশুদের খাওয়ান ভালো, পুষ্টি-বিজ্ঞনীদের এই মত।

কলা খেলে শিশুদের তড়কা অথবা ফিট হয়, এই ভুল ধারণাও অনেকের আছে। অপরিপক্ক কলা অন্যান্য কাঁচা ফলের মত দুষ্পাচ্য, হয়তো এ থেকে এই ধারণার উৎপত্তি। শিশুদের খাদ্যতালিকায় পাকা নরম ফলের একটি স্থান আছে, খুব অল্প বয়স থেকে শিশুরা কলা খেতে পারে।

দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের বদ্ধমূল ধারণা মহিষের দুধ খেলে শিশুদের মাথা মোটা হয়ে যায় অর্থাৎ বুদ্ধির বিকাশ হয় না। হয়তো মহিষের হাঁদা স্বভাবের জন্য এই আশ্চর্য এবং ভুল ধারণাটি হয়েছে। শুধু মাত্র ভুল ধারণার জন্য একটি উচ্চমানের পুষ্টিকর খাদ্যের মূল্য হ্রাস করা সত্যই খুব দুঃখজনক।

প্রসবের পর দু-তিনদিন প্রসূতির স্তন থেকে যে হলদেটে রং-এর দুধ নিঃসৃত হয় তাকে ইংরেজিতে 'কলোস্ট্রাম' (পীতমাতৃদুগ্ধ) বলে। কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পীতমাতৃদুগ্ধের সম্বন্ধেও ভুল ধারণা আছে। অনেকসময় শিশুকে জন্মের পর দু-তিনদিন পীতমাতৃদুগ্ধ পান করতে না দিয়ে, চিনির জল অথবা সন্তানবতী কোন আত্মীয়ার

স্তন পান করানো হয়। স্বাভাবিক দুধ আসার পর শিশুকে মায়ের স্তন পান করতে দেওয়া হয়। কলোস্ট্রামে উচ্চমানের পৌষ্টিক উপাদান ও এমন কয়েকটি মূল্যবান উপাদান থাকে যা শিশুকে রোগ-প্রতি-রোধের ক্ষমতা দেয় ও রোগের ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করে, কাজেই সদ্যোজাত শিশুকে তার স্বাভাবিক খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। তা ছাড়া শিশু মাতৃস্তন থেকে 'কলোস্ট্রাম' চুষে নিলে স্তনে তাড়াতাড়ি দুধ আসে। গরু-মহিষের 'কলোস্ট্রাম' ভারতীয়েরা অপবিত্র মনে করে পান করে না কিন্তু তারও পৌষ্টিক মূল্য খুব বেশি।

অপরিষ্কার ও সংক্রামণের জন্য ভারতীয় শিশুরা পেটের অসুখে খুব বেশি ভোগে। পেটের অসুখ সারাবার জন্যে শিশুদের ক্যাস্টর অয়েল খাওয়ানো হয়। এর ফল আরও খারাপ, এতে পেটের অসুখ বেড়ে যায় ও শিশুরা তাদের খাদ্য থেকে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে না। এর চেয়ে খারাপ নিয়ম হল পেটের অসুখে শিশুকে কিছু খেতে না দেওয়া, এমন কি জল পর্যন্ত না। শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে খাদ্য দিলেই এই সব অসুখের হাত এড়ান যায়। শিশুদের খাবার পাত্রগুলি পরিষ্কার কিনা, জল ও দুধ ঠিক মতো ফোটান কিনা সেদিকে মায়েদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের ও শিশুদের নির্ধারিত খাদ্য

জন্মের পর থেকে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য নির্ধারিত খাদ্য 6.1 তালিকায় দেওয়া হল। এটি পুষ্টিবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলতত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি।

তালিকা 6.1 **শিশুদের নির্ধারিত খাদ্য**

কাজ চালাবার মতো দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা

জন্ম থেকে প্রথম আট সপ্তাহ (ওজন 3-4 কেজি)

(ক) মায়ের দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে পেলে শুধু মায়ের দুধ। স্তন্যপানের বিশেষ প্রয়োজন।

(খ) মায়ের দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে না পেলে, অন্যান্য বেবিফুড অথবা গরু কিংবা মহিষের দুধ দিয়ে মায়ের দুধের স্থান পূরণ করতে হবে। গরু ও মহিষের দুধের সর তুলে দুধের সমান পরিমাণ জল তাতে মিশিয়ে পান করাতে হবে, বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে জলের পরিমাণ কমাতে হবে।

2-3 মাস (ওজন 6.5 কেজি পর্যন্ত)

(ক) মায়ের দুধ চলবে, এর সঙ্গে অথবা এর পরিবর্তে তিন-চতুর্থাংশ জল মেশানো মহিষের দুধ।

(খ) সব্জীর পাতলা স্যুপ চিনি কিংবা নুন মিশিয়ে খাওয়ানো শুরু করতে হবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ স্যুপ ঘন বা গাঢ় করতে হবে।

(গ) জল-মেশানো ফলের রস (কমলা, টমেটো, আপেল) অথবা সজনেপাতা জলে ফুটিয়ে সেই জল এখন খাওয়াতে হবে। 2-4 চামচ থেকে শুরু কার 3-4 মাস বয়সে 50-100 সি সি পর্যন্ত বাড়াতে হবে।

(ঘ) সম্ভব হলে কয়েক ফোঁটা হাঙ্গরের যকৃতের তেল দেওয়া চলে।

(ঙ) দিনে কয়েকবার ফোটানো জল খাওয়াতে হবে।

3-6 মাস (ওজন 8 কেজি পর্যন্ত)

(ক) দুধ চলবে (মায়ের অথবা বাইরের)। সেই সঙ্গে শুরু করতে হবে ঃ

(খ) টাট্‌কা শাকসব্জী (পালং কিংবা অন্য শাক, কচুপাতা) অথবা অন্য সব্জী (গাজর, টমেটো, বেগুন)। এইগুলি সিদ্ধ করে চটকিয়ে মোটা কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। গন্ধের জন্য লেবুর রসও মেশানো চলবে।

(গ) চটকানো পাকা ফল যেমন কলা, পেঁপে, আম এবং সিদ্ধ চটকানো সব্জী অথবা ফল যেমন পেয়ারা, এপ্রিকট, কুমড়া ইত্যাদি।

(ঘ) অল্প বা আধসিদ্ধ ডিমের কুসুম। প্রথমে অল্প পরিমাণ খাইয়ে ক্রমশ পরিমাণ বাড়িয়ে পুরো কুসুমটাই খাওয়াতে হবে।

(ঙ) মাছ অথবা মাংসের স্যুপ।

(চ) ছয় মাস বয়স হতে চললে—সুগন্ধি চাল, গম ও ডালের পরিজ (ঘরে তৈরি পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য 6.3 তালিকা দেখুন)।

(ছ) যতদূর সম্ভব বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য খাওয়াতে চেষ্টা করুন যাতে শিশু নতুন স্বাদ পছন্দ করতে পারে। প্রথমে অল্প পরিমাণে দিয়ে ক্রমশ পরিমাণ বাড়াবেন। শিশুকে খাবার জন্য জোর করবেন না, কিন্তু একবার না খেলেও দ্বিতীয়বার খাওয়াবার চেষ্টা করবেন।

6-9 মাস (ওজন $9\frac{1}{2}$ কেজি পর্যন্ত)

(ক) দুধ (একদিনে 450 সি সি পর্যন্ত)

(খ) চাল, গম, রাগী অথবা বাজরার পরিজ, দুধ ও চিনি মিশিয়ে (6 3 তালিকা দেখুন)

(গ) আগে যেমন বলা হয়েছে সে রকমভাবে চটকানো সব্জীসিদ্ধ অথবা সিদ্ধ ডাল বিশেষ করে মুগ ডাল।

(ঘ) নরম খাবারের টুকরো যেমন পাউরুটি, রুটি ইত্যাদি।

(ঙ) একটি পুরো ডিম সিদ্ধ অথবা চটকানো।

(চ) ভালোভাবে সিদ্ধ ও চটকানো মাছ কিংবা মাংস।

(ছ) বিভিন্ন নরম ফলের ছোট-ছোট টুকরো।

(জ) প্রচুর পরিমাণে ফোটানো জল।

9-12 মাস (ওজন 11 কেজি পর্যন্ত)

(ক) দুধ (প্রতিদিন 400 সি সি)

(খ) আগে যেসব খাবার কথা বলা হয়েছে সেই সব খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সেই সব খাদ্য না চটকিয়ে বড়োদের খাবার মত করে দিতে হবে, যেমন সিদ্ধ সব্জীর টুকরো ও মাংসের টুকরো।

(গ) যাতে নতুন দাঁত ও মাঢ়ীর ব্যায়াম হয় সেজন্য শক্ত খাবার যেমন পাউরুটি টোস্ট করে, অথবা গাজরের টুকরো দিতে হবে।

এখন এই পৌষ্টিক তত্ত্বগুলি আলোচনা করা যাক—

1. সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে মায়ের দুধের মতো উপকারী খাদ্য নেই। শিশুর কয়েকমাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধই তার প্রকৃতিদত্ত পূর্ণ পৌষ্টিক আহার। মায়ের দুধে এমন রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা শিশুকে রোগ-প্রতিরোধ করার শক্তি যোগায়। এই কথাটি বিশেষ করে 'পীত-মাতৃদুগ্ধ' সম্বন্ধে সত্য। শিশুর জন্মের দু-তিনদিন পর্যন্ত মাতৃস্তন থেকে হলুদ রঙের যে তরল পদার্থ নিঃসৃত হয় তাকে 'কলোস্ট্রাম' বলে। 'কলোস্ট্রামে' শিশুর প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ 'এ', 'পোষ্টিক-পীত' রূপে প্রচুর পরিমাণে থাকে, যা শিশুর পক্ষে খুবই উপকারী, তাই জন্মের পর থেকেই শিশুকে স্তন্যপান করানো উচিত। স্তনদুগ্ধ পান করাবার আর একটি লাভ এই যে শিশুকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে এই দুধ পান করানো যায়, কারণ এ দুধ মাতৃস্তন থেকে সোজা শিশুর মুখে চলে আসে। আর গরু ও মহিষের দুধ অথবা অন্যান্য বেবিফুড খুব সাবধানভাবে তৈরি করে না খাওয়ালে তা সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হয় না। এর ফলে শিশুর রোগের ছোঁয়াচ লাগতে পারে। এ ছাড়া মায়ের দুধ পান করার সময় শিশু মার স্নেহ ভালবাসার যে স্পর্শ পায় শিশুর মানসিক আবেগসমূহের বিকাশ ও মায়ের তৃপ্তিসাধনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই সব কথা মনে রেখে মায়েদের যতদিন সম্ভব শিশুদের স্তন্যদান করতে উৎসাহ দেওয়া দরকার।

2. অনেক ভারতীয় মহিলারই অনেক দিন ধরে স্তনে প্রচুর দুধ থাকে। যে-সব শিশুদের মায়ের দুধ তাড়াতাড়ি ছাড়ানো হয়, অথচ তারা উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য পায় না, সেই সব শিশুদের তুলনায় অন্য ভারতীয় শিশুরা যারা এক বছর (অবশ্য একটু বেশি সময়) পর্যন্ত মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কিছু খায় না তারা বেশি স্বাস্থ্যবান। অবশ্য

পুষ্টিবিজ্ঞানের মতে মায়ের দুধ পান করার পক্ষে এক বছর বেশি সময়। মায়ের দুধে যে পৌষ্টিক উপাদান থাকে তা শিশুর 3-6 মাস বয়স পর্যন্ত সব রকম শারীরিক চাহিদা মেটাতে পারে। যখন শিশু মায়ের দুধ আর যথেষ্ট পরিমাণে পায় না, তখন গরু বা মহিষের দুধ দিয়ে তা পূরণ করা উচিত। এ সময় কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রথমত শিশু মায়ের দুধ পান করতে অভ্যস্ত, সে-দুধ গরু-মহিষের দুধ অপেক্ষা স্নেহপদার্থ কম। কাজেই দুধের সর তুলে কিছুটা স্নেহপদার্থ কমিয়ে সে-দুধ শিশুকে পান করাতে হবে। গরু-মহিষের দুধে মায়ের দুধের থেকে প্রোটিন বেশি কিন্তু শর্করা কম থাকে। কাজেই গরু ও মহিষের দুধে, সমান পরিমাণ জল ও প্রয়োজন মতো চিনি মিশিয়ে শিশুকে পান করাতে হবে। শিশু বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে সর তোলা ও জলের পরিমাণ কমাতে হবে।

3. শিশুর অধিক পরিমাণে ফোটানো জলের দরকার হয়। জল পান না করালে তাকে যে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হবে তা তার ভাল ভাবে হজম হবে না ও পুরো মাত্রায় তা শরীরের কাজে লাগবে না। তার জন্মাবার প্রথম মাসেই শিশুকে রোজ অন্তত 200 সি সি জল দেওয়া দরকার।

4. শিশুর জন্য যে পরিমাণ গরু বা মহিষের দুধ দরকার, অনেক সময় তার দাম বেশি পড়ে, অথবা তা যোগাড় করার অসুবিধা হয়। তখন 6.2 তালিকায় দেওয়া পদ্ধতি অনুসারে, চিনাবাদাম, নারকোলের টুকরো অথবা সয়াবীন থেকে, শিশুদের খাদ্যোপযোগী, দুধের মতো তরল পদার্থ বার করা যায়। বনস্পতি থেকে পাওয়া দুধ ও গরুর দুধের পৌষ্টিক গঠনের সাদৃশ্য আছে। গরুর দুধের মতো এই দুধেরও সর তুলে জল ও চিনি মিশিয়ে শিশুদের খাওয়াতে হয়।

তালিকা 6.2

চিনাবাদাম, নারকোল ও সয়াবীনের দুগ্ধ প্রস্তুতপ্রণালী

চিনাবাদামের দুধ

1. টাটকা চিনাবাদাম ব্যবহার করতে হবে। চিনাবাদামের খোসা ছাড়ান। শুকনো অথবা অপুষ্ট দানা ব্যবহার করবেন না।
2. বাদামগুলিকে 5-10 মিনিট শুকনো খোলায় ভাজুন। ওপরের পাতলা গোলাপী খোসাটি ছাড়িয়ে ফেলুন।
3. এক কাপ খোসা ছাড়ানো সাদা চিনাবাদাম পরিষ্কার জলে দুঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। জল ফেলে দিয়ে বাদামগুলিকে চাকি অথবা হামানদিস্তায় মিহি করে পিষে নিন। প্রয়োজন মতো অল্প জল ব্যবহার করবেন।
4. এবার পেষা বাদামের সঙ্গে 5 কাপ গরম জল মিশিয়ে 5 মিনিট ধরে ভালোভাবে জোরে জোরে নাড়তে থাকুন। তারপর কাপড়ে ছেঁকে নিলে দুধ বার হবে।
5. গরম করবার সময়ও ভালোভাবে নাড়তে হবে তাতে দুধের থেকে সুগন্ধ বেরোবে। পরিষ্কার করা পাত্রে এই দুধ 8-10 ঘণ্টা রাখা যায়। ঠাণ্ডা দুধের উপর থেকে সর তুলে নিন।

নারকোলের দুধ

1. একটি নারকোল কুরুন। শুকনো নারকোলও ব্যবহার করা চলে কিন্তু তাতে দুধ ততটা সুস্বাদু হয় না।
2. কোরা নারকোলের উপর আধ কাপ গরম জল ঢেলে নারকোল কোরাগুলি চাপুন। দুধ আলাদা পাত্রে ঢেলে নিন।
3. আবার আধ কাপ গরম জল ঢেলে নারকোল কোরাগুলি চাপুন। দুধ ঢেলে আগের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নিন।
4. কয়েক মিনিট ধরে ফুটিয়ে দুধ কাপড়ে ছেঁকে নিন।

সয়াবীনের দুধ

1. খারাপ অথবা বিবর্ণ সয়াবীন ব্যবহার করবেন না। ঠাণ্ডা জলে বীনগুলিকে দুবার ধুতে হবে।
2. চার কাপ জলে এক কাপ সয়াবীন সারারাত ধরে ভিজতে দিন (6-8 ঘন্টা)।
3. জল ফেলে দিয়ে বীনগুলিকে আরও ধুয়ে নিন।
4. এক চিমটি সোডা অথবা বেকিং পাউডার, দুকাপ ফুটন্ত জল দিয়ে চাকি অথবা হামানদিস্তায় বীনগুলিকে মিহি করে পিষে নিন।
5. আরও এক কাপ ফুটন্ত জলে মিশিয়ে কাপড়ে ছাঁকুন। তারপর তরল দুধ সংগ্রহ করুন।
6. সুগন্ধের জন্য খুব ভালোভাবে ফোটান। ইচ্ছা করলে দুধের সঙ্গে দুটি এলাচও ফোটাতে পারেন যদি সুগন্ধ চান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—দুধ বার করে নেবার পর যে অবশিষ্ট শক্ত পদার্থ পড়ে থাকবে তা দিয়ে বড়া, রুটি, মিষ্টি ইত্যাদি তৈরি করা যায়। এগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় কাজেই সঙ্গে সঙ্গে এসব ব্যবহার করে ফেলবেন।

---

5. একজন ভাল স্বাস্থ্যবতী মায়ের দুধ ও গরু-মহিষের দুধ শিশুর পক্ষে যদিও খুবই সুখাদ্য, তথাপি এতেও কয়েকটি পৌষ্টিক উপাদানের ঘাটতি থাকে। মায়ের দুধে এই ঘাটতি বেশি হয় যদি মা স্বাস্থ্যহীনা হন অথবা পৌষ্টিক উপাদানযুক্ত সুষমখাদ্য না পান। এই চারটি পৌষ্টিক উপাদান হল লোহা, খাদ্যপ্রাণ 'সি' 'এ' ও 'ডি'। সেজন্য শিশুদের এমন কি দু-তিন মাস বয়সের হলেও সব্জী অথবা সজনেপাতার সুপ, ফলের রস, পাকাকুমড়োর মতো নরম সব্জী ও হাঙ্গরের যকৃতের তেল-খাওয়ানো বাঞ্ছনীয়, অতএব এগুলি শিশুকে খাওয়ানো উচিত।

6. শিশু আরও একটু বড়ো হলেই তার পৌষ্টিক উপাদানগুলির চাহিদা বেড়ে যায়। তাছাড়া শিশু বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের দুধও কমে যায়। দাঁত ওঠবার সময় হজমের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম শিশুর শরীরে তৈরি হতে থাকে। তাই এই সময় মুখ্য ও গৌণ পৌষ্টিক উপাদান-যুক্ত বিভিন্ন প্রকারের শক্ত খাদ্যের পরিমাণ তার উত্তরোত্তর বাড়ানো দরকার। এই সব খাদ্যের মধ্যে পড়বে, চটকানো সিদ্ধ টাটকা শাক, পাকা ফল, সুসিদ্ধ ডিম, মাছ ও মাংস (প্রথমে স্যুপ তারপর ছোট ছোট টুকরো করে খেতে দিতে হবে), শস্যখাদ্য ও ডালের ঘন থকথকে পরিজ প্রভৃতি।

7. শিশুকে মায়ের দুধ ছাড়িয়ে ক্রমশ অন্য খাদ্য ধরানোকে চলতি ভাষায় দুধ ছাড়ানো বলে। আমরা দেখেছি যে দুধ ছাড়াতে দেরি করা উচিত নয় কারণ তাতে শিশুর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। পুষ্টির দিক থেকে বিচার করলে এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মায়ের দুধে পৌষ্টিক উপাদান ভালোই থাকে। গরু ও মহিষের দুধে মায়ের দুধ অপেক্ষা প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ বেশি থাকে, কাজেই মায়ের দুধ ছাড়িয়ে এ দুধ ধরালে শিশুর পৌষ্টিক মান বেড়ে যায়। মায়ের দুধ অথবা তোলা দুধ ছাড়িয়ে শিশুকে যখন শক্ত খাদ্য ধরানো হয় তখন তাকে সাধারণত শুধু সিদ্ধ ভাত অথবা গম দেওয়া হয়। এতে তার খিদে মিটতে পারে কিন্তু এই খাবারে প্রোটিন, খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ উপাদানের ঘাটতি পড়ে। এর ফলে শিশুর বাড়বার সময় যখন তার পৌষ্টিক উপাদানের চাহিদা খুব বেশি, সেই সময়ে তার খাদ্যের পৌষ্টিক মান কমে যায়। এ অবস্থা সহজেই এড়ানো যেতে পারে। সহজলভ্য সাধারণ খাদ্য যেমন ডাল, চিনা-বাদাম, গুড় ও চাল গম এবং বাজরা দিয়ে উঁচু পৌষ্টিক মানের খাবার তৈরি করা যায়। ন্যাশন্যাল ইনস্টিটুট অব নিউট্রিশন 6-12 মাস বয়সের শিশুদের, দুধ-ছাড়াবার পর প্রয়োজনীয় হয় এমন একটি খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করেছেন। এতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবহারোপযোগী খাদ্য ও তার প্রস্তুতপ্রণালী দেখানো হয়েছে। 6.3 নং তালিকাটি দেখুন।

তালিকা 6.3

6-12 মাস বয়সের শিশুদের খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালী

প্রতিটি খাবার 500-550 ক্যালরি ও 15-20 গ্রাম প্রোটিন যোগায়। এ হল শিশুর পৌষ্টিক উপাদানের চাহিদার অর্ধেক। বাকিটা শিশু মায়ের অথবা তোলা দুধ থেকে পাবে।

উত্তরাঞ্চল

1. চিঁড়া-ক্ষীর

চিঁড়া	40 গ্রাম	(ক) চিঁড়া কয়েক মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখুন।
কাবলিছোলা	50 গ্রাম	(খ) কাবলিছোলা সিদ্ধ করে চটকে নিন।
কলা	25 গ্রাম	(গ) কলা চটকে ছোলার সঙ্গে মিশিয়ে নিন।
গুড়	50 গ্রাম	(ঘ) গরম জলে গুড় গুলে ছেঁকে নিন।
		(ঙ) সব কটি উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

2. মিঠি ডাল

চাল	30 গ্রাম	(ক) শুকনো খোলায় চাল ভেজে গুঁড়িয়ে নিন।
মুসুরডাল	60 গ্রাম	(খ) শুকনো খোলায় মুসুরডাল ভেজে গুঁড়িয়ে নিন।
পালংশাক	30 গ্রাম	(গ) পালংশাক সিদ্ধ করে চটকিয়ে ছাঁকনিতে ছেঁকে নিন।
গুড়	60 গ্রাম	(ঘ) গুড় জলে গুলে ছেঁকে নিন।
		(ঙ) সব গুলি মিশিয়ে কাই-এর মতো করুন ও কয়েক মিনিট সিদ্ধ করুন।

3. সিরা (হালুয়া)

আটা	60 গ্রাম	(ক) আটা শুকনো খোলায় ভেজে জলে সিদ্ধ করুন।
ভাজা চিনাবাদাম	30 গ্রাম	(খ) চিনাবাদাম-ভাজা গুঁড়ো করুন।

গুড়	50 গ্রাম	(গ) গুড়ের রস মিশিয়ে উপরের উপকরণগুলি দিয়ে ঘন কাই-এর মতো তৈরি করে কয়েক মিনিট জ্বাল দিন।

4. ডালিয়া

আধভাঙ্গা গম	45 গ্রাম	(ক) শুকনো খোলায় গম ভাজুন।
মুগডাল	45 গ্রাম	(খ) শুকনো খোলায় মুগডাল ভাজুন।
গুড়	60 গ্রাম	(গ) ডাল ও গম এক সঙ্গে মিশিয়ে পরিমাণ মতো জল দিয়ে নরম না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করুন।
		(ঘ) জলে গুড় গুলে ছেঁকে সেই রস গম ও ডাল সিদ্ধর সঙ্গে মিশিয়ে নিন।

দক্ষিণাঞ্চল

1. ক্ষীরা পোংগল

চাল	50 গ্রাম	(ক) শুকনো খোলায় চাল ভেজে গুঁড়িয়ে নিন।
মুগডাল	50 গ্রাম	(খ) শুকনো খোলায় মুগডাল ভেজে গুঁড়িয়ে নিন।
কিরাই (অ্যামারান্থ)	50 গ্রাম	(গ) সিদ্ধ কিরাই থকথকে করে ছেঁকে নিন।
তেল	10 গ্রাম	(ঘ) উপরের উপকরণগুলির সঙ্গে ফুটন্ত জল মিশিয়ে কয়েক মিনিট ফোটান, আধা শক্ত মতো হলে নামিয়ে নিন।
নুন প্রয়োজন মতো		
জিরা প্রয়োজন মতো		
		(ঙ) তেলে জিরা ফোড়ন দিয়ে পোংগলে ঢেলে দিন।

2. মুস্থর পায়সম্

মুস্থরডাল	40 গ্রাম	(ক) মুস্থরডাল সিদ্ধ করে ভালোভাবে পিষে নিন।
আটা	50 গ্রাম	(খ) শুকনো খোলায় আটা ভাজুন।
পালংশাক	20 গ্রাম	(গ) পালংশাক সিদ্ধ করে ঘন করে ছেঁকে নিন।

গুড়	40 গ্রাম	(ঘ) গুড় জলে গুলে ছেঁকে নিন।
		(ঙ) উপরের উপকরণগুলি ভালোভাবে মিশান যেন ডেলা না থাকে। থাকলে ডেলা ভেঙ্গে দেবেন।
		(চ) কয়েক মিনিট জ্বাল দিন।

3. রাগী পরিজ

রাগী	30 গ্রাম	(ক) প্রথমে রাগীর মণ্ট তৈরি করতে রাগী সারারাত জলে ভিজিয়ে রেখে পরদিন একটি প্লেটে রাগীর দানা ছড়িয়ে ভিজে কাপড়ে দু-তিনদিন রেখে দিন। তাতে কল বেরোবে। রৌদ্রে শুকিয়ে নিন। এরপর শুকনো খোলায় ভাজুন, সুগন্ধ বেরোলে নামাবেন। বায়ুশূন্য টিনের কৌটায় ভরে রাখুন।
কাবলিছোলা ভাজা	50 গ্রাম	(খ) কিরাইশাক সিদ্ধ করে থকৃথকে করে ছেঁকে নিন।
কিরাই	30 গ্রাম	(গ) ছোলাভাজা গুঁড়িয়ে তার সঙ্গে ছাঁকা কিরাইশাক ও রাগী মণ্ট মিশিয়ে দিন।
		(ঘ) মিশ্রণটির সঙ্গে জল মিশিয়ে অল্প সময় জ্বাল দিন।
গুড়	50 গ্রাম	(ঙ) গুড় জলে গুলে ও তারপর ছেঁকে মিশিয়ে দিন।

পূর্বাঞ্চল

1. মিষ্টি চিঁড়া

চিঁড়া	50 গ্রাম	(ক) চিঁড়া জলে ভিজিয়ে চটকে নিন।
চিনাবাদাম	40 গ্রাম	(খ) চিনাবাদাম ভেজে গুঁড়ো করে চিঁড়ার সঙ্গে মিশিয়ে নিন।

গুড় 50 গ্রাম (গ) গুড়ের রস তৈরি করুন।

(ঘ) গুড়ের রস মিশিয়ে চিনাবাদাম ও চিঁড়ার মিশ্রণটিকে কয়েক মিনিট জ্বাল দিন। জমাট ভাব হলে নামিয়ে নিন।

2. সব্জীর ক্ষীর

গম 30 গ্রাম (ক) গম শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়িয়ে নিন।

কাবলিছোলা 60 গ্রাম (খ) কাবলিছোলা শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়িয়ে নিন।

পালংশাক 30 গ্রাম (গ) গুড়ের রস তৈরি করুন।

গুড় 70 গ্রাম (ঘ) গম ও কাবলিছোলা গুড়োর সঙ্গে গুড়ের রস মিশিয়ে ঘন থকথকে কাই তৈরি করুন।

(ঙ) পালংশাক চটকিয়ে কাপড়ে অথবা ছাঁকনিতে ছেঁকে নিন।

(চ) মিশ্রণটির সঙ্গে ছাঁকা পালংশাক মিশিয় কয়েক মিনিট জ্বাল দিন। জ্বাল দেবার সময় নাড়তে হবে, জমাট বাঁধলে নামিয়ে নিন।

3. চিনাবাদামের ক্ষীর

চাল 50 গ্রাম (ক) শুকনো খোলায় চাল ভেজে গুঁড়ো করুন।

চিনাবাদামের আটা 50 গ্রাম (খ) চাল গুঁড়োর সঙ্গে চিনাবাদামের আটা মিশিয়ে জলে সিদ্ধ করুন।

গুড় 50 গ্রাম (গ) গুড়ের রস করে মিশ্রণটিতে ঢেলে দিন।

(ঘ) কয়েক মিনিট জ্বাল দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন যেন ডেলা বেঁধে না যায়।

(ঙ) জমাট বেঁধে আসলে উনুন থেকে নামিয়ে নিন।

পশ্চিমাঞ্চল

1. বাজরা ক্ষীর

বাজরা	50 গ্রাম	(ক)	শুকনো খোলায় ভেজে বাজরা গুড়িয়ে নিন।
মুসুরডাল	50 গ্রাম	(খ)	শুকনো খোলায় ভেজে ডাল গুড়িয়ে নিন।
গুড়	50 গ্রাম	(গ)	বাজরা ও চালের গুড়ো অল্প জলে সিদ্ধ করুন।
		(ঘ)	গুড়ের রস করে মিশ্রণটিতে ঢেলে দিন।

2. রাগী (নাচনা) ও ছানার ক্ষীর

কাবলিছোলা	50 গ্রাম	(ক)	রাগীর আটা জল মিশিয়ে পিষে ছাঁকনিতে ছেঁকে নিন।
রাগীর (নাচনা) আটা	50 গ্রাম	(খ)	ছাঁকা রাগী ফোটান।
		(গ)	ছোলা শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করুন।
গুড়	50 গ্রাম	(ঘ)	ছোলার গুঁড়ো ফুটন্ত রাগী আটার গুলে ঢেলে সুগন্ধ বেরিয়ে জমাট না বাঁধা পর্যন্ত, অনবরত নাড়তে থাকুন।
		(ঙ)	গুড়ের রস ঢেলে দিন।

3. শিং দান্য হালুয়া

আটা	50 গ্রাম	(ক)	শুকনো খোলায় আটা ভেজে নিন।
চিনাবাদামের আটা	25 গ্রাম	(খ)	শুকনো খোলায় চিনাবাদামের আটা ভেজে গমের আটার সঙ্গে মেশান।
গুড়	50 গ্রাম	(গ)	গুড়ের রস করে ভাজা আটায় ঢেলে দিন।
তেল অথবা বনস্পতি	5 গ্রাম	(ঘ)	কয়েক মিনিট জাল দিন ও অনবরত নাড়তে থাকুন যেন ডেলা না বেঁধে যায়।
		(ঙ)	গরম তেল ঢেলে উনান থেকে নামিয়ে নিন।

8. বাজারে অনেক প্রকার শিশুখাদ্য (বেবি ফুড) পাওয়া যায়। সব চেয়ে ভালো ফল পেতে হলে শিশুখাদ্যের টিনের কৌটার গায়ে যে নির্দেশ দেওয়া থাকে তা মেনে চলা দরকার। ঐ একই ইনস্টিটুট থেকে একটি ভালো গুঁড়ো শিশুখাদ্য তৈরির প্রণালী উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই গুঁড়ো শিশুখাদ্য বাড়িতে তৈরি করে রাখা যায়। তুষ-ছাড়ানো রাগী অথবা বাজরা 60 গ্রাম ঃ মুগ অথবা অন্য কোন ডাল 15 গ্রাম ঃ চিনাবাদাম 10 গ্রাম ও তিল 5 গ্রাম ঃ এই সব উপকরণকে আলাদা আলাদা শুকনো খোলায় ভেজে, আলাদা আলাদা করে গুঁড়ো করুন, তারপর এই সব গুঁড়োকে 15 গ্রাম সরতোলা দুধ (স্কিমড মিল্ক)-এর গুঁড়োর সঙ্গে মেশান। একটি বায়ুশূন্য টিনের কৌটায় অথবা বোতলে ভরে রাখুন। তিন টেবিল-চামচ ভর্তি এই গুঁড়ো অল্প গরম জলে মিশিয়ে গরম করুন তাতে নুন অথবা চিনি মেশান। একটি ছয় মাস বয়সের শিশুকে দিনে তিনবার খাওয়াবার জন্য এই পরিমাণ খাদ্য যথেষ্ট। এই শিশুখাদ্যটি বেশি পরিমাণে তৈরি করে ঘরে রাখা চলে।

9. প্রতি মাসে শিশুর ওজন নিয়ম করে নেবেন ও তার হিসাব রাখবেন। তালিকা 6.4-এ বিভিন্ন বয়সের শিশুর ওজন দেখানো হয়েছে তা থেকে শিশুর ঠিক ঠিক বাড় হচ্ছে কি-না ভালোভাবে জানা যাবে। প্রথম ছয় মাস, প্রায় 0.9 কেজি করে প্রতি মাস শিশুর ওজন বাড়া উচিত।

অপরিণত ও অতি ক্ষুদ্র শিশু

জন্মের সময় অপরিণত শিশুর পূর্ণ বিকাশ থাকে না। এ রকম শিশুর ওজন কম থাকে ও পেশীগুলি খুবই দুর্বল হয়। শরীরে চর্বি এত সামান্য থাকে যে নেই-বললেও হয়। এমন কি শরীরের কাঠামোও সুগঠিত হয় না। এই শিশুর পাকস্থলীটি ছোট হওয়ার ফলে খুব

অল্প পরিমাণ খাদ্য এরা হজম করতে পারে, বিশেষ করে তা যদি স্নেহ-পদার্থ হয়। স্বেদগ্রন্থীগুলি ভালোভাবে কাজ করে না ফলে শিশুর দৈহিক তাপ সবসময়ে এক থাকে না, ওঠা নামা করে। সে কারণে এ রকম শিশুকে ভালোভাবে ঢেকে গরম রাখার বিশেষ প্রয়োজন।

এ সব শিশুকে বিশেষ সাবধানে খাওয়াতে হবে। এদের মায়ের দুধ চুষে খেতে অসুবিধা হয়, কাজেই জন্মের প্রথম কয়েকদিন ঔষধ খাওয়াবার ড্রপারে করে খাওয়ানো দরকার হতে পারে। এ সময়ে মায়ের দুধও হয়তো পাওয়া যায় না, তাই প্রথম দরকার এদের তরল কিছু খাওয়াবার, যেমন জল মেশানো দুধ ও ফোটানো জল। প্রতি দু-ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে। চায়ের চামচের আধ চামচ করে শুরু করে ক্রমশ তা বাড়িয়ে চায়ের চামচের এক চামচ পরিমাণ দিতে হবে।

গরু ও মহিষের দুধে শিশুর প্রয়োজনের অধিক প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ থাকে। সম্ভব হলে সম্পূর্ণ স্নেহপদার্থ দুধ থেকে উঠিয়ে নেওয়া খুবই দরকার, তারপর তাতে সমান পরিমাণ ফোটানো জল মেশাতে হবে। সরতোলা (স্কিমড) দুধের গুঁড়ো ব্যবহার করা যেতে পারে। 18 গ্রাম সরতোলা দুধের সঙ্গে 11 গ্রাম চিনি (অথবা গ্লুকোজ কিংবা ল্যাকটোজ) এবং 150 সি সি ফোটানো জল মেশালে শিশুর খাদ্য তৈরি হয়। যদি বাজারের কেনা শিশুখাদ্য খাওয়ান তবে টিনের কৌটায় লেখা নির্দেশ পালন করবেন।

প্রায় তিনমাস পর অপরিণত জাত শিশু ও কম ওজনের দুর্বল শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে স্বাভাবিক ওজন অর্থাৎ প্রায় 6 কেজি হওয়া উচিত। স্বাভাবিক শিশুদের খাদ্য যার কথা আগেই বলা হয়েছে, দুর্বল শিশুদের ধীরে ধীরে সেই পথ্য শুরু করানো উচিত।

তালিকা 6.4

ভারতীয় শিশুদের উচ্চতা ও দৈহিক ওজন

শিশু

বয়স	ওজন, কেজি	বয়স	ওজন কেজি
জন্মসময়	3.0	1 বৎসর	9.5
2 মাস	5.0	2 বৎসর	11.5
4 মাস	6.5	3 বৎসর	14.0
6 মাস	7.5	4 বৎসর	16-17
8 মাস	8.5	5 বৎসর	18-19
10 মাস	9 0		

বালক বালিকা

বয়স	বালক		বালিকা	
বছর	উচ্চতা সেমি	ওজন কেজি	উচ্চতা সেমি	ওজন কেজি
5	113.1	19.3	112.0	18.6
6	118.9	22.1	117.3	21.4
7	123.3	24.5	122.7	24.8
8	127.9	26.4	126.8	26.1
9	133.6	30.0	132.3	29.7
10	138.5	32.4	138.5	33 5

কিশোর-বয়সী

বয়স	কিশোর		কিশোরী	
বছর	উচ্চতা সেমি	ওজন কেজি	উচ্চতা সেমি	ওজন কেজি
11	143.4	35.3	144.1	36.5
12	148.9	38.8	150.3	42.6
13	154.9	42.9	153.0	44.4
14	161.7	48.3	155 1	46.7
15	165.3	52.2	155 3	48.2
16	168.4	55.5	155.4	49.8
17	168.9	59.0	156.4	49.9

বড়ো শিশুদের খাদ্য

একটি সুস্থ স্বাভাবিক একবছরের শিশু ভালো করে চিবিয়ে দাঁতে গুঁড়ো করে খেতে পারে না, সেজন্য পৌষ্টিক উপাদানগুলি নরম খাদ্যের মাধ্যমে তাকে খাওয়ানো প্রয়োজন। তার সবগুলি পৌষ্টিক উপাদানেরই প্রয়োজন এবং সে এখন বিভিন্ন প্রকারের খাবার খেতে পারে। অবশ্য তার খাদ্যের পরিমাণ বেশি নয় এবং তারা আস্তে আস্তে খায়। এর ফলে শিশুটি হয়তো তার প্রয়োজনের চেয়ে কম খায় এবং বাড়ির বড়োরা যা খায় সেও সম্ভবত সেই একই খাবার খায়। কিন্তু তার খাদ্য থেকে শিশু যতটুকু ক্যালসিয়াম ও কয়েকটি খাদ্যপ্রাণ (সি, বি$_{12}$ ও ফলিক অ্যাসিড) পায় শিশুর প্রয়োজন তা থেকে বেশি। এই রকম শিশুদের ভালোভাবে বাড়বার জন্য উচ্চমানের পৌষ্টিক খাদ্যের দরকার। তালিকা 6.4-এ বয়সের অনুপাতে শিশুদের কত ওজন হওয়া উচিত তা দেওয়া হয়েছে।

হায়দ্রাবাদের ন্যাশন্যাল ইনস্টিটুট অব নিউট্রিশন 1 থেকে 3 বছর বয়সের শিশুদের জন্য সুস্বাদু খাদ্য তৈরি করার প্রণালী বার করেছেন। এই সব খাদ্য সাধারণ উপকরণ দিয়ে তৈরি হলেও এই সব খাদ্যের পৌষ্টিক উপকরণ খুব বেশি। তালিকা 6.5-এ এই সব খাদ্য তৈরির প্রণালী বলা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রুচি অনুযায়ী উল্লিখিত খাদ্যের যে কোন একটি শিশুকে প্রতিদিন দেওয়া যেতে পারে। শিশুর স্বাভাবিক খাদ্যের সঙ্গে টাটকা ফল, স্যালাড ও রাঁধা শাকসব্জী খাওয়ালেই তার সুষমখাদ্য হবে।

তালিকা 65

1-3 বৎসর বয়সের শিশুর উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালী

প্রত্যেকটি পদে 500-550 ক্যালরি এবং 15-20 গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যাবে। এই পরিমাণ শিশুর চাহিদার অর্ধেক। বাকিটা শিশু অন্যান্য খাবার থেকে পাবে।

উত্তরাঞ্চল

1. জোয়ারের খিচুড়ি

জোয়ারের সুজি	50 গ্রাম	(ক) জোয়ারের সুজি জলে সিদ্ধ করুন।
গুড়	50 গ্রাম	(খ) কুমড়ো, গাজর টুকরো করুন।
মুগডাল	50 গ্রাম	(গ) সিদ্ধ জোয়ার, ডাল ও সব্জী একসাথে মিশিয়ে তাতে গুড় গুলে ঢেলে দিন।
কুমড়ো	30 গ্রাম	
গাজর	30 গ্রাম	(ঘ) ঢিমে আঁচে কয়েক মিনিট জ্বাল দিয়ে নামিয়ে নিন।

2. মিঠি রোটি

গমের আটা	75 গ্রাম	(ক) গুড় জলে গুলে ছেঁকে নিন।
চিনাবাদামের আটা	30 গ্রাম	(খ) গমের ও চিনাবাদামের আটা গুড়ের রস দিয়ে মেখে নিন।
গুড়	60 গ্রাম	(গ) এবার লেচি কেটে রুটি বেলে নিন।
		(ঘ) চাটুতে ফেলুন, ইচ্ছা হলে অল্প তেলে ভাজতে পারেন।
		(ঙ) এক টুকরো পেঁপে ও এক গ্লাস ঘোলের সঙ্গে এই রুটি খেতে দিন।

3. দই খিচুড়ি

সরতোলা দুধ গুঁড়ো	30 গ্রাম	(ক) গুঁড়ো দুধ থেকে দুধ করে দই পাতুন।
কাবলিছোলা	55 গ্রাম	
বাজরা	55 গ্রাম	(খ) বাজরা আধ সিদ্ধ করুন।
তেল	10 গ্রাম	(গ) এবার কাবলিছোলা দিয়ে পুরোটা সিদ্ধ করুন।
নুন ও জিরা		(ঘ) তেল গরম করে জিরা ফোড়ন দিয়ে ঢেলে দিন। আন্দাজ মত নুন দিন।
		(ঙ) দইয়ের সঙ্গে খিচুড়ি পরিবেশন করুন।

পূর্বাঞ্চল

1. টমেটো স্যুপ

সিদ্ধ চাল	75 গ্রাম	(ক) কাবলিছোলা ও চাল একসঙ্গে খুব নরম না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করুন।
কাবলিছোলা	50 গ্রাম	
সজনেপাতা	50 গ্রাম	(খ) সজনেপাতা ও টমেটো একসঙ্গে সিদ্ধ করে পাতলা কাপড় অথবা ছাঁকনিতে ছেঁকে নিন।
পাকা টমেটো	100 গ্রাম	
তেল	10 গ্রাম	
আন্দাজ মত নুন		(গ) এবারে উপরের সব উপকরণ মিলিয়ে কয়েক মিনিট জ্বাল দিয়ে ঢেলে দিন।

2. মিষ্টি খিচুড়ি

মুড়ি	75 গ্রাম	(ক) শুকনো খোলায় ডাল ভেজে গুঁড়িয়ে নিন।

অড়হরডাল	60 গ্রাম	(খ) মুড়ি মিইয়ে গেলে, মুড়িও ভেজে গুঁড়িয়ে নিন।
গুড়	90 গ্রাম	(গ) মুড়ি ও ডাল একসঙ্গে মিশিয়ে জলে সিদ্ধ করুন।
গাজর	30 গ্রাম	(ঘ) গাজর কোরা ও গুড় মেশান গাজর নরম না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করুন।

৪. মুড়ির টফি

মুড়ি	60 গ্রাম	(ক) মুড়ি মিইয়ে গেলে ভেজে গুঁড়ো করুন।
কাবলিছোলা	60 গ্রাম	(খ) শুকনো খোলায় কাবলিছোলা ভেজে গুঁড়ো করুন।
গুড়	60 গ্রাম	(গ) ঘন করে গুড়ের রস করুন।
		(ঘ) গুড়ের রসে মুড়ি ও ছোলার গুঁড়ো মিশান। তাড়াতাড়ি অনবরত নাডতে থাকুন যেন ডেলা না বেঁধে যায়।
		(ঙ) কয়েকমিনিট জ্বাল দিয়ে তেল লাগানো থালায় ঢালুন।
		(চ) জমে যাবার পর টুকরো করে কেটে নিন।

দক্ষিণাঞ্চল

1. জোয়ার (চোলাম) উপ্‌মা

জোয়ারের সুজি	60 গ্রাম	(ক) তেলে অল্প সরষে, কলাইয়ের ডাল ও পেঁয়াজ ভেজে নিন।
চিনাবাদাম ভাজা	30 গ্রাম	

পেঁয়াজ	10 গ্রাম	(খ) নুন ও জল ঢেলে ফোটান।
ধনেপাতা	10 গ্রাম	(গ) জোয়ারের সুজি দিন ও নরম না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করুন।
তেল	10 গ্রাম	
সরষে, কলাইয়ের ডাল ও নুন		(ঘ) চিনাবাদাম ভাজা গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিন।

২. **মশলা ইডলি তার সঙ্গে চাটনি**

জোয়ার (চোলাম)	50 গ্রাম	(ক) জোয়ার ও কলাইয়ের ডাল আলাদা করে কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন।
কলাইয়ের ডাল	25 গ্রাম	
চিনাবাদাম ভাজা	30 গ্রাম	(খ) আলাদা করে বেটে নিন ।
গাজর	30 গ্রাম	(গ) এবার দুটিকে মিশিয়ে পাঁচ ছয় ঘণ্টা রাখুন যাতে গেঁজে যায়।
কাবলিছোলা ভাজা	5 গ্রাম	(ঘ) এবার জোয়ার ও ডাল বাটায় গাজর কুঁচিয়ে দিন ও নুন মেশান।
তেল, নুন, সরষে	10 গ্রাম	
		(ঙ) যে ভাবে ইডলি তৈরি করে করুন।
		(চ) কাবলিছোলা ও চিনাবাদাম বেটে চাটনি তৈরি করুন। স্বাদের জন্য বাটবার সময় নুন ও সরষে দেবেন।

৩. **রাগী পুট্টু**

রাগী	60 গ্রাম	(ক) আলাদা আলাদা শুকনো খোলায় রাগী ও অড়হরডাল ভেজে গুঁড়ো করুন।
অড়হরডাল	45 গ্রাম	

গুড়	50 গ্রাম	(খ) জলে গুড় গুলে ছেঁকে নিন।
		(গ) রাগী ও অড়হর গুঁড়োর সঙ্গে গুড়ের রস মিশিয়ে ঘন কাই তৈরি করুন।
		(ঘ) এই কাই এবার ভাপে বসান যতক্ষণ না কাই বাসন থেকে খুলে আসে।
		(ঙ) ঠাণ্ডা করুন ও টুকরো করে কাটুন।

পশ্চিমাঞ্চল

1. খামান ঢোকলা

বাজরা	50 গ্রাম	(ক) শুকনো খোলায় বাজরা ও ডাল পিষে গুঁড়ো করে নিন।
মুসুরডাল	50 গ্রাম	
গুড়	50 গ্রাম	(খ) অল্প জলে সিদ্ধ করুন।
		(গ) গুড়ের রস বাজরা ও ডাল সিদ্ধতে ঢেলে দিন।

2. রাগী (নাচনা) চা পোলী

রাগীর (নাচনা) আটা	45 গ্রাম	(ক) শুকনো খোলায় ডাল ভেজে গুঁড়ো করুন।
গমের আটা	20 গ্রাম	
অড়হরডাল	20 গ্রাম	(খ) ডাল গুঁড়ো, রাগীর ও গমের আটা গুড় গোলা দিয়ে মাখুন।
গুড়	55 গ্রাম	
তেল	5 গ্রাম	(গ) লেচি কেটে রুটি বেলুন।
		(ঘ) চাটুতে তেল দিয়ে রুটি ভেজে নিন।

3 **পোলাও ও শুকনো নারকোলের (কোপরা) চাটনি**

চাল	60 গ্রাম	(ক)	সব্জী গুলো কেটে টুকরো করে নিন।
গাজর	30 গ্রাম		
ফরাসবীন	20 গ্রাম		
সাদা কুমড়ো (চাল কুমড়ো)	25 গ্রাম		
		(খ)	চাল ডাল ও সব্জী, নরম না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করুন।
তেল	8 গ্রাম		
অড়হরডাল	30 গ্রাম		
আন্দাজ মতো নুন		(গ)	নুন ও গরম তেল ঢেলে উনুন থেকে নামিয়ে নিন।
শুকনো নারকোল	20 গ্রাম	(ক)	নারকোল ও নুন একসঙ্গে বেটে নিন।
কলাইয়ের ডাল	10 গ্রাম		
তেল	2 গ্রাম	(খ)	তেলে কলাইয়ের ডাল, সরষে ও লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে নারকোল বাটা ঢেলে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন।
আন্দাজ মতো নুন, লঙ্কা ও অল্প সরষে			
		(গ)	পোলাও-এর সঙ্গে চাটনি পরিবেশন করুন।

3 থেকে 5 বছরের একটু বড়ো বয়স্কশিশুরা উপযুক্ত প্রায় সব খাবারই খেতে পারে। হায়দ্রাবাদ ইনস্টিটুটের তৈরি সুষমখাদ্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী 6.6 তালিকায় যে রকম দেখানো হয়েছে, তেমন খাবার খাওয়ালে, এ-বয়সের শিশু তার প্রয়োজনীয় সব পৌষ্টিক উপাদানগুলি পাবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতবর্ষের সব অঞ্চলের শিশুদেরই এই খাদ্য দেওয়া যেতে পারে কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের রুচির মতন খাদ্য এই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

গর্ভাবস্থায় মায়েদের খাদ্য

ভারতীয় দরিদ্র পরিবারের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে কি তথ্য পাওয়া গেছে? একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা 20 জনের গর্ভপাত হয়েছে, নয়তো শিশু অপরিণত জন্মেছে কিংবা মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে বা এরকম আরও কিছু হয়েছে। তাদের খাদ্যের ক্যালরিগত মূল্য 1500 যা সুপারিশ করা 2500 ক্যালরির অনেক কম। দরিদ্র পরিবারে এমনিতেই অর্থের অনটন, তার উপর এ সময় গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের কাজও থাকে না যার ফলে অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে, বাড়তি আয়ের তো প্রশ্নই ওঠে না। একে খাদ্য কম তার উপর গর্ভাবস্থায় বমি হয় সে জন্য খাদ্যের পুরো পুষ্টি তারা পায় না। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদের উপযুক্ত খাদ্য না পাওয়ার কারণ উপরোক্ত সব কয়টিই। যেখানে প্রতিদিন প্রায় 55 গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন সেখানে তারা 40 গ্রাম প্রোটিন পায় কি-না সন্দেহ। এই প্রোটিন প্রধানত শস্যখাদ্য ও ডাল থেকে সংগৃহীত হওয়ায় তা সাধারণ মানের হয়। এই স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের 'বি'-গোষ্ঠী খাদ্যপ্রাণের অভাব আর অনেকের 'এ' খাদ্যপ্রাণের অভাব দেখা যায়। এই মায়েদের যে-সব সন্তান জীবন্ত জন্মায় তাদের আকার ও ওজন (গড়পড়তা 2.8 কেজি) সচ্ছল পরিবারের স্ত্রীলোক যারা সুষমখাদ্য পায়, তাদের শিশুদের আকার ও ওজন (গড়পড়তা 3.1 কেজি) অপেক্ষা কম। বাস্তবিকই দেখা গেছে ভারতীয় উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রসূতি ও শিশুদের অবস্থা যে কোন ধনীদেশের প্রসূতি ও শিশুদের মতোই। এ থেকেই বোঝা যায় যে গর্ভাবস্থায় ভালো অর্থাৎ সুষমখাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়।

একটি স্বাস্থ্যবতী মহিলা যার কোন পৌষ্টিক উপাদানের অভাব নেই বরং যার দেহে, কিছু পৌষ্টিক উপাদান সঞ্চিত আছে, তিনিই গর্ভস্থ শিশুর পৌষ্টিক উপাদানের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। যদি তিনি গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করেন তবে তাঁর শরীরে সঞ্চিত পৌষ্টিক

উপাদানগুলি খরচ হবে না। মায়ের পুষ্টির মান ভাল থাকলে মৃত-শিশু প্রসবের সম্ভাবনার চেয়ে সুস্থ স্বাভাবিক শিশু প্রসব করার সম্ভাবনা বেশি।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ওজন প্রায় 8 কেজি বেড়ে যায়। এই ওজনের অর্ধেকের কম হল গর্ভস্থ শিশুর ওজন। এটা অবশ্য খুবই সহজ করে বলা হল, তবে একথা বললে ভুল হবে না যে গর্ভিণীকে বাস্তবিকই দুজনের খাবার নিজের ও গর্ভস্থ শিশুর জন্য খেতে হয়। তিনি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে না খান তবে তাঁর শরীরে সঞ্চিত পৌষ্টিক উপাদানগুলি খরচ হয়ে তার রক্তশূন্যতার সম্ভাবনা বাড়বে, হাড় নরম হয়ে যাবে (সাধারণত দেখা যায় যে পা বেঁকে যাচ্ছে) তা ছাড়া খাদ্যপ্রাণ 'বি'-গোষ্ঠীর ও 'এ'র ঘাটতির লক্ষণসমূহ দেখা যাবে। আমরা দেখেছি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বাড়তি ক্যালরি ও বাড়তি প্রোটিনের প্রয়োজন। বিশেষ করে তিনি যদি চাকরি করেন কিংবা তাঁকে বৃহৎ পরিবারের দেখাশোনা করতে হয়; এতে তাঁকে অধিক পরিমাণে কায়িক শ্রম করতে হয় ও তাতে তাঁর অনেকটা শক্তি ব্যয় হয়। এই সময় কয়েকটি খাদ্যপ্রাণও বেশি পরিমাণে দরকার হয়। শিশুর হাড় ও দাঁত গঠনের জন্য বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়ামও দরকার, তাই বেশি দুধ, মাছ, রাগী, টাটকা শাকসব্জী ও ডাল খাওয়া তার প্রয়োজন। শিশুর রক্ত তৈরির জন্য মায়ের লোহা অতিরিক্ত পরিমাণে শিশুর শরীরে চলে যায়। সেজন্য মায়ের সঞ্চিত লোহার পরিমাণ বাড়ানোর বিশেষ প্রয়োজন। জন্মের সময় শিশুর শরীরে যেন বাড়তি লোহা থাকে কারণ মায়ের দুধে (যা প্রথম কয়েকমাস শিশুর একমাত্র খাদ্য) বিশেষ লোহা থাকে না। শরীরে বাড়তি লোহা থাকে না বলে অনেক ভারতীয় শিশুই জন্মের কিছুদিন পরেই রক্তশূন্যতায় ভোগে। লোহা বেশি পরিমাণে আছে এমন খাদ্য, যেমন টাটকা শাক, বাজরা, রাগী (অন্য সব শস্যখাদ্যে লোহা যৎসামান্য থাকে), প্রভৃতির নিয়মিত খাওয়া

তালিকা 6.6

3 থেকে 5 বছরের বালক-বালিকাদের খাবার ছক

সময়	খাবার	পরিমাণ
সকাল 8টা থেকে 9টা	রাঁধা শস্যখাদ্য—ডাল প্রধান	2-3 চামচ
	কিংবা	
	ইডলি	1-2 ইডলি
	কিংবা	
	মাখন লাগান রুটি	1-2 টুকরো
	কিংবা	
	মুড়ির মতো ফোলান রাগী ও দুধ	সামান্য পরিমাণ
	আধসিদ্ধ, পোচ কিংবা ঘাঁটা ডিম সিদ্ধ	1টা ডিম
	কিংবা	
	সিদ্ধ ডাল	1 চামচ
	ফোটানো দুধ (গরু কিংবা মহিষের)	½ গ্লাস
10 30	ফলের রস	½ গ্লাস
	অথবা	
	সময়ের তাজা ফল	1 প্লেট

দুপুর 12-30 থেকে 1টা	ভাত	2-4 চামচ
	অথবা	
	আটা কিংবা রাগীর রুটি	1-2 রুটি
	অথবা	
	আলুসিদ্ধ, মিষ্টি আলু কিংবা টেপিওকা (মাঝে মাঝে)	সামান্য পরিমাণ
	দই অথবা দুধ	$\frac{1}{2}$ গ্লাস
	রাঁধা শাক কিংবা কাঁচাসব্জী	1-2 চামচ
	কিংবা	
	কাঁচাসব্জীর সালাড, সপ্তাহে তিনবার রাঁধা সব্জীর বদলে	$1\frac{1}{2}$-2 চামচ
বিকাল 3টা থেকে 4টা	জ্বাল দেওয়া দুধ (গরু কিংবা মহিষের)	$\frac{1}{2}$ গ্লাস
	মাছের যকৃতের তেল	1 চামচ
রাত্রি 7টা থেকে 8টা	শস্যখাদ্য যেমন, রাঁধা সুজি, ডালিয়া কিংবা রাগীর পরিজ	2-3 চামচ
	সিদ্ধ ডাল, রান্না মাছ অথবা মাংস	2 চামচ
	জ্বাল দেওয়া দুধ (শোবার সময়)	$\frac{1}{2}$ গ্লাস

দরকার। প্রসূতির রক্তশূন্যতা দূর করার কাজে লৌহ ঔষধের বড়িও খুব উপকারী।

গর্ভাবস্থায় ফলিক অ্যাসিড ও খাদ্যপ্রাণ 'বি$_{12}$'-র প্রয়োজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি জিনিস বিভিন্ন খাদ্যবস্তু থেকে সংগ্রহ না করে ঔষধের বড়িতে খাওয়াই ভাল। 'বি'-গোষ্ঠীর অন্যান্য খাদ্যপ্রাণ (থায়ামিন, রিবোফ্লাবিন ও নিয়াসিন) যেগুলির বাড়তি প্রয়োজন হয়, তা টাটকা শাক, চিনাবাদাম ও ডাল থেকে পাওয়া যায়। গর্ভাবস্থায় বমির ভাব কমানোর জন্য সজনেপাতার নির্যাস, লেবুর রস, কমলালেবুর রস অথবা আমলকী, যাতে খাদ্যপ্রাণ 'সি' থাকে, সকালে খেলে উপকার হয়। একবারে বেশি পরিমাণ খাওয়া গর্ভিণীর পক্ষে কষ্টকর, তাই তাকে বারে বারে ও বিশেষ করে জলখাবার মতো অল্প পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য, প্রধান খাওয়ার মাঝে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। তালিকা 6.7এ পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরি কয়েকটি পদের প্রস্তুতপ্রণালী দেওয়া হয়েছে। এই পদগুলি জল-খাবারের মতো খাওয়া যাবে। গর্ভিণীর প্রচুর পরিমাণে ফোটানো জল পান করা উচিত যাতে তার ভক্ষিত খাদ্য ভালোভাবে হজম হয় ও তা থেকে সুফল পাওয়া যায়।

স্তন্যদাত্রী মায়েদের খাদ্য

গর্ভাবস্থা ঠিক ন মাস থাকে। ভারতবর্ষে স্তন্যদানের সময় মায়ের শরীর থেকে পৌষ্টিক উপাদানগুলি দুধ হয়ে ক্ষুধার্ত শিশুর দেহে যায়। মা যদি তার খাদ্য থেকে নিজের শরীরের পৌষ্টিক উপাদানগুলির ঘাটতি পূরণ না করেন ও বুকের দুধের জন্য বাড়তি পৌষ্টিক উপাদানও গ্রহণ না করেন তা হলে স্বাভাবিক ভাবেই মা দুর্বল ও শক্তিহীনা হয়ে পড়বেন। অনেক ভারতীয় মাতারই, স্তন্যদান কালে ওজন কমে যায়, এ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁর খাদ্যের মান ও পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়।

তালিকা 6.7

মিশ্রণের দ্বারা খাদ্যে নানাপ্রকার পৌষ্টিকতা বৃদ্ধি এবং তাহা অধিকতর বৃদ্ধি করার উপায়

পদ	উপকরণ	সম্ভাব্য উন্নতি
	উত্তরাঞ্চল	
খিচুড়ি	চাল, তিল, বাজরা, চিনি	কলবেরোনো বাজরা ব্যবহার করুন। ছোলার ডাল ও সজী দিন ; দইয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।
ভরোই পরটা	গমের আটা, আলু, ফুলকপি	ডাল গুঁড়ো অথবা চিনাবাদাম ভাজা গুঁড়ো আটার সঙ্গে মিশিয়ে নিন ; রান্না করা টাটকা শাক ব্যবহার করুন।
ভাজিয়া	ছোলার বেশন ও মিশ্র সজী	ছোলার কল বার করুন, টাটকা শাক সিদ্ধ অথবা ভাজা পূর হিসাবে ব্যবহার করুন।
	দক্ষিণাঞ্চল	
ইডলি	চাল, কলাইডাল	কিছু ছোলার বেশন ও এক চিমটি চুনের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন।
দোসা	ভাঙ্গা চাল, কলাইডাল	টাটকা শাক ও অন্যান্য সজী ব্যবহার করুন।
দহিবড়া	চাল, কলাইডাল, দই	কলাইডালের কল বার করুন। এক চিমটি চুনের গুঁড়ো দিন।
রাগী পট্টু	রাগী	অড়হরডাল, কাবলিছোলার গুঁড়ো রাগীর সঙ্গে মেশান।

সস্তার ভাত	চাল, অড়হরডাল	চালের সঙ্গে আধ ভাঙ্গা গম মিশিয়ে দিন। ডালের কল বার করুন। এক চিমটি চুনের গুঁড়া দিন।
	পূর্বাঞ্চল	
রাগী দোসা	রাগী, গমের আটা, দই	রাগীর কল বার করুন ; কল-বেরোনো কিছু অড়হরডালের গুঁড়ো ব্যবহার করুন।
লেটো	রাগী, চাল, ডাল	রাগী ও ডালের কল বার করুন ; পাঁচমিশালী ডাল ব্যবহার করুন।
পুরন পোলি	গমের আটা, কাবলিছোলা, গুড় ও নারকোল	কল-বেরোনো রাগীর আটা ও কল-বেরোনো ছোলা ব্যবহার করুন।
	পশ্চিমাঞ্চল	
ঢোকলা	আধ ভাঙ্গা গম, মুসুরডাল	কল-বেরোনো রাগী ও ডাল ব্যবহার করুন। পাঁচমিশালী ডালো টাটকা শাক ব্যবহার করলে ভালো ; এক চিমটি চুনের গুঁড়ো দিন।
ডেবরা রোটি	গমের আটা, ডাল	উপরের পদ্ধতিতে তৈরি করুন।
খিচুরি	চাল ডাল	ডালের কল বার করে নিন।
শিরা (সুস্বাদু)	সুজি, চিনাবাদাম	কল-বেরোনো ডাল, টাটকা শাক ও সব্জী ব্যবহার করুন।

প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লোহা মায়ের দুধে যে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় তা মায়ের দেহে সঞ্চিত ভাণ্ডার হতে সোজাসুজি দুধে যায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভারতীয় দরিদ্র মায়ের বুকেও দুধ বেশি থাকে. 500 সি সি (আধ লিটার) মতো আর এই দুধ প্রায় এক বছর থাকে। আগে থেকেই পৌষ্টিকতার অভাবগ্রস্ত মায়ের শরীর থেকে এই পৌষ্টিক উপাদানের নিষ্কাশন কত ক্ষতিকর তা সহজেই অনুমান করা যায়। তারপর যদি অল্প ব্যবধানে পরপর দু-তিনটি সন্তানের জন্ম হয় তা হলে মায়ের স্বাস্থ্য ও শক্তি একেবারেই ভেঙে পড়ে। সে মা আর আগের মতো হাসি খুশি থাকতে পারে না।

অবশ্য মায়ের শরীর থেকে সবগুলি পৌষ্টিক উপাদান নেওয়া হয় না। মায়ের খাদ্য পুষ্টিকর না হলে মায়ের দুধও উপযুক্ত পুষ্টিকারক হবে ন ফলে শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেখা গেছে দরিদ্র ভারতীয় মায়েদের বুকের দুধে, খাদ্যপ্রাণ 'এ' রিবোফ্লাবিন, থায়ামিন ও খাদ্য-প্রাণ 'সি' খুব অল্প পরিমাণে থাকে।

ক্যালরি, প্রোটিন, খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পৌষ্টিক উপাদান যোগাবার জন্য জলযোগের মত বারে বারে অল্প পরিমাণে বাড়তি পুষ্টিকর ও উত্তম আহারের দরকার। এই জলযোগের মধ্যে থাকবে দুধ, দই, ডাল, সিদ্ধ অথবা ভাজা চিনাবাদাম, জৈব খাদ্য যেমন ডিম, মাছ ও মাংস, টাটকা শাক ; শস্যের মধ্যে রাগী ও বাজরা। এগুলিকে সুস্বাদু করে রান্না করতে হবে। তালিকা 6.7এ কয়েকটি পদের রান্নার প্রণালী দেওয়া হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে ফোটানো জল পান করাও দরকার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খাদ্যের পূর্ণ উপযোগ

আমরা যেটুকু খাদ্যসামগ্রী পাই তাকে পুষ্টির দিক থেকে ভালোভাবে কাজে লাগাবার অনেকগুলি উপায় আছে। এই উপায় হল খাদ্যদ্রব্য ভালো করে বেছে কেনা, পুষ্টির মান বাড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে খাদ্যবস্তু মিশিয়ে রান্না করা, আর যাতে পৌষ্টিক উপাদানগুলি নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া। এ ছাড়া আরও কয়েকটি উপায় হল খাদ্যদ্রব্যের কোনো-কোনোটি অল্প সিদ্ধ করা, কোনোটি ফুটিয়ে নেওয়া, কারও বা কল বার করা, কোনোটির খামির করা অর্থাৎ গেঁজিয়ে নেওয়া ও কোনোটিকে চুনের জলে ভিজিয়ে নেওয়া।

বেছে খাদ্য কেনা

1. চাল গমের বদলে অন্তত কিছুটা সস্তা শস্যখাদ্য যেমন রাগী, জোয়ার ও বাজরা কিনুন। পৌষ্টিক দিক থেকে বিচার করলে খাবার সময় একটি শস্যের বদলে দুটি বা তিনটি শস্য মিশি... বার কয়েকটি উপায়ও তা ছাড়া সস্তা দামে ভাঙা চাল, সিদ্ধ ও ... ভাবে ব্যবহার করুন। সাদা ও ছাঁটা চা... খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ শ্রেণীর পৌ...

2. বিভিন্ন প্রকারের ডাল এমন কি সস্তা ডাল কিনুন। খোসা সমেত আস্ত ডালের দাম খোসা ছাড়ানো ভাঙা ডালের চাইতে কম।

3. কয়েকটি সব্জীর ডগার পাতা ও শাক পুরো সব্জীর চেয়ে ভালো। বীটের পাতা, মূলো ও গাজরের পাতা কখনো ফেলে দেবেন না, তরকারি করে নেবেন। বিভিন্ন প্রকারের টাটকা শাক দামেও সস্তা আর এগুলি খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পৌষ্টিক উপাদানের ভালো উৎস।

4. সেই সব সব্জী কেনা ভালো যা কাঁচা খাওয়া যায় যেমন, কুচানো গাজর, পেঁয়াজ, মূলা, শশা এবং চাটনি, যা তৈরি হয় পুদিনা-পাতা, তেঁতুল পাতা ও গাজর দিয়ে। আমলকী খাদ্যপ্রাণ 'সি'-র সস্তা ও উত্তম উৎস। আচার অথবা মোরব্বা করে আমলকী অনেকদিন রাখা যায়।

5. অনেক সব্জীর পৌষ্টিক মূল্য নেই শুধু পদের বৈচিত্র্য আনবার জন্য খাওয়া হয়। অসময়ের দামী তরিতরকারি কেনা অপেক্ষা সময়ের সস্তা তরিতরকারি কেনা ভালো।

6. দামী খাদ্য মানেই পুষ্টিকর খাদ্য নয়। দামী আপেল ও আঙুরের চাইতে সময়ের পেঁপে ও আম খাওয়া ভাল। আতা, সফেদা (চিকু), কমলা ও মৌসমি পুষ্টিকর এবং দামও অপেক্ষাকৃত কম। খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পৌষ্টিক উপাদানের জন্য ফল খাবার দরকার নেই, বেশি পরিমাণে কাঁচা সব্জী ও টাটকা শাক খেলেই চলে এবং তা দামেও সস্তা।

7. ঘিএর চাইতে তেল সস্তা এবং এর পৌষ্টিক মূল্য ঘি অপেক্ষা বরং বেশি। ঘিএর গুণ বাড়িয়ে বলা হয়। এই সৌখিন
দেওয়া যায়।
কিংবা প্রদীপ জ্বালাবার জন্য. ঘি অথবা
ও সরষের তেল কিনবেন না

কারণ এসব তেল আহার্য বস্তু, এর এইভাবে ব্যবহার দুষ্প্রাপ্য খাদ্যের অপচয়মাত্র।

9. অনেক সময় স্কিমড মিল্ক পাউডার কিনলে সাধারণ দুধের চাইতে সস্তা পড়ে। পুষ্টির দিক থেকেও এই দুই প্রকার দুধের স্নেহ-পদার্থ থাকে না। স্কিমড মিল্ক পাউডারের দুধের দইও পাতা যায়।

10. গুড় চিনির চেয়ে সস্তা, চিনির বদলে গুড় উপযুক্ত পদে ব্যবহার করুন।

সুবেবিচিত খাদ্যদ্রব্যের মিশ্রণ

1. শুধু একপ্রকার শস্যখাদ্য গ্রহণ করা অপেক্ষা একই প্রকার শস্যখাদ্য মিশ্রিত করে গ্রহণ করা সবসময়ে ভালো। একটি শস্যখাদ্যের বদলে যদি সেই পরিমাণ দুটি শস্যখাদ্য মিশিয়ে (চাল ও গম রাগী ও চাল) খাওয়া হয় তার উপকারিতা বেশি।

2. সেই রকম দু-তিন রকমের ডাল একসঙ্গে মিশিয়ে রান্না করলে প্রোটিনের মান বেড়ে যায়, বিশেষ করে মিশ্রিত শস্যখাদ্যের সঙ্গে এ-রকম মিশ্রিত ডাল খেলে ফল আরও ভালো হয়। আমাদের চিরা-চরিত রান্নায় একরকমের শস্যখাদ্য ও একই রকমের ডালের বদলে মিশ্রিত শস্যখাদ্য ও পাঁচমিশালী ডাল ব্যবহার করলে তা যেমন পুষ্টিকর হয় তেমনি তার স্বাদে ও গন্ধে বৈচিত্র্য আসে।

3. আমাদের ভারতীয় খাদ্যের একটি সমস্যা পরিমাণ-আধিক্য, কারণ আমরা এমন সব শস্য (যেমন চাল) ব্যবহার করি যা রাঁধলে মাপে বেড়ে যায়। খাদ্যের পরিমাণ স্থূলতা কমাবার উপায় হিসাবে এমন সব পদ রান্না করুন যাতে কয়েকটি খাদ্যবস্তুর মিশ্রণ থাকে। পূর্ব পরিচ্ছেদে 6.7 তালিকায় এই রকম কয়েকটি পদের উল্লেখ করা হয়েছে ও সেই সঙ্গে খাদ্যের পৌষ্টিক মূল্য বাড়াবার কয়েকটি উপায়ও আলোচনা করা হয়েছে।

4. খাওয়ার সময় অল্প দই বা ঘোল খেলে সমস্ত খাদ্যের প্রোটিন-মূল্য আশ্চর্য রকম বেড়ে যায়। দই ফেটিয়ে মাখন বার করে নিলে অবশিষ্ট যে ঘোল থাকে তাতে খাদ্যপ্রাণ 'এ' ও স্নেহপদার্থ থাকে না কারণ মাখনের সঙ্গে চলে যায় ; এ ছাড়া দুধের প্রোটিন, খনিজ পৌষ্টিক উপাদান ও প্রায় সব খাদ্যপ্রাণগুলিই ঘোলে থাকে।

5 দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা ঠিক করার সময় মনে রাখবেন আমাদের খাদ্যকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় এবং প্রতিটি ভাগ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য বেছে নিলে আমরা সুষমখাদ্য পাব। তালিকা 7.1এ খাদ্যের এই পাঁচটি ভাগ দেখানো হয়েছে। প্রতিটি ভাগ থেকে রোজ দু-একটি খাবার বেছে নেবেন। মনে রাখবেন টাটকা শাক যা সস্তায় পাওয়া যায়, অন্তত একরকম সেই শাক দিনে একবার খাওয়া উচিত। আলাদা একটি শাকের তরকারি না করে অন্য পদের মধ্যে শাক দিতে পারেন কিংবা জলখাবারে শাক দিয়ে কিছু তৈরি করে দিতে পারেন। কাঁচা সব্জী বা ফল দিনে অন্তত একবার খাওয়া দরকার।

খাদ্যের পৌষ্টিক উপাদানগুলি সংরক্ষণের উপায়

1. কতকগুলি পৌষ্টিক উপাদান, বিশেষ করে খাদ্যপ্রাণ 'সি' রান্না করলে ও আলো-হাওয়ার সংস্পর্শে এলে সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এই রকম পৌষ্টিক উপাদানযুক্ত সব্জী, সে কারণে কাঁচা অবস্থায় স্যালাড করে খেলে তাতে বেশি উপকার হয়। যেমন টুকরো করে কাটা গাজর, পেঁয়াজ, মূলা ও শশা খাওয়া যায়, অথবা পাকা পুদিনা, কাঁচা পেঁয়াজ, তেঁতুল, টাটকা তেঁতুলপাতা ও নারকোল দিয়ে চাটনি করেও খাওয়া যায়।

2. ভাত সিদ্ধ করতে ঠিক কতটা জল লাগে তার একটা আন্দাজ করে নেবেন। সাধারণত চালের পরিমাণের দুই বা আড়াই গুণ জল

দিলে ভাত সিদ্ধ হয় অথচ ফ্যান থাকে না। বেশি জল দিলে ফ্যান ফেলে দিতে হয় ও তার সঙ্গে উপকারী খাদ্যপ্রাণসমূহ ও খনিজ পৌষ্টিক উপাদানগুলি বেরিয়ে যায় ও অপচয় হয়।

3. সব্জী সর্বদা অল্প জলে সিদ্ধ করবেন। পাত্রের মধ্যে সব্জী ও জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে আ চে বসাবেন। এত জল দেবেন না যাতে শেষে ফুটিয়ে তরকারির জল শুকাতে হয়। ভাতের ফ্যান কিংবা সব্জীসিদ্ধ জল ফেলে দেবেন না। অন্য তরকারি রশম বা কোন ঝোল রাঁধবার সময় জলের বদলে ফ্যান অথবা তরকারিসিদ্ধ জল ব্যবহার করবেন তাতে পৌষ্টিক উপাদানগুলির অপচয় হবে না।

4. সব্জী ভাজলে, সাবধানে সিদ্ধ করার চাইতে বেশি খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয় কারণ ভাজলে বেশি তাপের দরকার হয় ও সে সময় সব্জীগুলি হাওয়ার সংস্পর্শে আসে।

5. শাক ভাল করে ধুয়ে তার জল ঝেড়ে রান্না করতে হয়। শাকে প্রচুর জল থাকে বলে এতে আর জল দেবার দরকার হয় না।

6. ছোট মুখওয়ালা মাটির পাত্রে শাকপাতা কয়েকদিন রাখা যায়। জল বেশি থাকে এমন সব্জী যেমন টমেটো, বেগুন প্রভৃতি ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে রাখবেন। শুকনো সব্জী যেমন আলু ও পেঁয়াজ শুকনো বাক্সে রাখবেন ও তাতে যেন হাওয়া লাগে।

7. সব্জী জলে ভিজিয়ে রাখবেন না, রাঁধবার আগে কলের জলে ধুয়ে নেবেন। বড়ো-বড়ো টুকরো করে সব্জী কাটলে রান্নার সময় তার পৌষ্টিক উপাদানগুলি সংরক্ষিত থাকে।

8. ঠাণ্ডা জলে তরকারি দিয়ে ফোটানোর চাইতে গরম জলে তরকারি ছাড়া ভালো।

9. তরকারির খোসা পাতলা করে ছাড়ান, কারণ পৌষ্টিক উপাদানগুলি খোসার নিচেই থাকে। আলু, রাঙালু, বীট, মুখিকচু, চুপড়ি আলু খোসাশুদ্ধ সিদ্ধ করে পরে খোসা ছাড়ান।

তালিকা 7.1 খাদ্যের 5টি ভাগ

1ম ভাগ : শস্যখাদ্য, মূল ও কন্দ

(এরা মুখ্যত শক্তি অথবা ক্যালরি যোগায়)

চাল, গম, জোয়ার বাজরা, রাগী প্রভৃতি, টেপিওকা, আলু, রাঙালু, চুপড়ি আলু, মুখিকচু

2য় ভাগ : প্রোটিনযুক্ত খাদ্য

(এই শ্রেণীর খাদ্য মুখ্যত প্রোটিন যোগায় যদিও শস্যখাদ্য থেকে প্রোটিন পাওয়া যায়)

ডাল, ছোলা, কড়াইশুঁটি, বীন, চিনাবাদাম, তিল, কাজুবাদাম, বাদাম, নারকোল, দুধ, দই, ঘোল, ছানা ও খোয়া

ডিম, মাছ, মাংস, মুরগী, শূয়োরের মাংস ও গোমাংস

3য় ভাগ : চর্বি (স্নেহপদার্থ)/তেল, চিনি/গুড়

(এই সব খাদ্য ক্যালরি অথবা শক্তি যোগায় ও স্বাদ বাড়ায়)

উদ্ভিজ্জ তেল, বনস্পতি, ঘি, মাখন, চিনি ও গুড়

4র্থ ভাগ : শরীররক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব্জী ও ফল

(এরা প্রধানত খাদ্যপ্রাণ ও খনিজজাতীয় পৌষ্টিক উপাদানের উৎস। যতদূরসম্ভব এই সব সব্জী ও ফল কাঁচা খাওয়া উচিত)

'ক' বিভাগ : শাকপাতা (পালং, কিরাই, কচুপাতা, ধনে, পুদিনা, সজনেপাতা, সরষেশাক, ধনেশাক, মেথি)

'খ' বিভাগ : হলুদ অথবা কমলা রঙের ফল ও সব্জী (পেঁপে, আম, হলদে কুমড়ো, গাজর)

'গ' বিভাগ : এমন সব্জী ও ফল যাতে খাদ্যপ্রাণ 'সি' অধিক পরিমাণে থাকে (আমলকী, পেয়ারা, লেবু, কমলালেবু, মুসাম্বি, টমেটো, সজনেডাঁটা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওল, কুল ও ফলসা)

5ম ভাগ : অন্যান্য সব্জী

(এরা নিরামিষ রান্নার স্বাদ ও গন্ধে বৈচিত্র্য আনে ও ছিবড়া বা আঁশযুক্ত বলে ভালো হজম করায়)

ফল, ডাঁটা, গাছের ফুল ও পাতা (বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, করলা, লাউ কুমড়ো ও ঐ জাতীয় অন্যান্য সব্জী, কাঁচকলা, সজনেডাঁটা, বাঁধাকপি, ফুলকপি)

10. রান্নার সময় তরকারির রঙ ঠিক রাখার জন্য কখনো সোডা ব্যবহার করবেন না, কারণ সোডা খাদ্যপ্রাণ নষ্ট করে। যেখানে অম্ল-পদার্থ দেওয়া দরকার সেখানে তেঁতুলগোলা, লেবুর রস, অথবা টক ঘোল দিলে পৌষ্টিক উপাদানগুলি বিশেষত খাদ্যপ্রাণ 'সি' নষ্ট হয় না।

11. প্রেসার-কুকারে তাড়াতাড়ি রান্না হয় ও এর মুখ বন্ধ থাকে বলে মুখ খোলা পাত্রে রাঁধা খাদ্য অপেক্ষা প্রেসার কুকারের তৈরি খাবারে পৌষ্টিক উপাদান কম নষ্ট হয়।

পৌষ্টিক উপাদান বাড়াবার জন্য ধান সিদ্ধ করা

সিদ্ধ-চাল তৈরি করতে হলে ধানকে 2-3 দিন ধরে জলে ভিজিয়ে রেখে, তাকে সিদ্ধ করতে হয় অথবা তাতে ভাপ দিতে হয়। এরপর সেই ধান শুকিয়ে নিয়ে ভানতে হয়, তাতে বাদামী রঙের তুষ থেকে চাল আলাদা হয়ে যায়। অনেক সময় বেশিদিন জলে রাখলে ধান গেঁজে গিয়ে চালে দুর্গন্ধ হয় ও খেতে বিস্বাদ লাগে। তাই সিদ্ধচাল কেনার সময় বেছে দুর্গন্ধবিহীন ভালো চাল কিনবেন। মহীশূরের সেণ্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটুট ধান সিদ্ধ করার একটি উন্নত ধরনের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। ধান 65-67° সেন্টিগ্রেড গরম জলে মাত্র 2-3 ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে তারপর শুকিয়ে নিয়ে তা ভানতে হবে। এই পদ্ধতিতে দুর্গন্ধ-বিহীন সিদ্ধচাল পাওয়া যাবে।

সিদ্ধ করার সময় অধিকাংশ পৌষ্টিক উপাদানই তুষ থেকে শস্যে চলে যায়। বাড়িতে রাঁধলে আতপচালের চাইতে সিদ্ধচালের ফ্যানের সঙ্গে কম পৌষ্টিক উপাদান অপচয় হয়। কলে-ছাঁটা চালের চাইতে সিদ্ধচালের পৌষ্টিক মূল্য অধিক। থায়ামিন (খাদ্যপ্রাণ বি$_1$) ও রিবোফ্লাবিন (খাদ্যপ্রাণ বি$_2$) এই দুটি উপাদান আতপচালের দ্বিগুণ সিদ্ধচালে থাকে। এছাড়া বাড়িতে চাল পরিষ্কার করে নিলে এই অতিরিক্ত পৌষ্টিক উপাদানের অল্পই অপচয় হয়।

শুকনো ভাজা ও ফোলানো

গম, চাল, যব ইত্যাদি শস্য ও ডালজাতীয় খাদ্য, কাবলিছোলা ও মটর শুকনো ভেজে ফোলানো হয়। প্রথমে ভিজিয়ে রেখে হঠাৎ গরম করলে শস্যের ভিতরের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। সেই বাষ্পের চাপে শস্যগুলি ফুলে ওঠে। সকলের মুখরোচক মুড়ি ও পপকরন (ভুট্টার খই) এই জাতীয় খাদ্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এভাবে ভাজলে শস্যগুলি বেশ মচ্‌মচে হয় ও এই ভাবেই খাওয়া যায়, অথবা চিনাবাদাম ভাজা, কাবলিছোলা, পেঁয়াজ ও নারকোলকোরা মিশিয়ে, নয়তো দুধ ও চিনি দিয়ে অথবা গুড় দিয়ে মোয়া করেও খাওয়া যায়। মোটা করে গুঁড়িয়ে তা দিয়ে পরিজ তৈরি করে বাচ্চাদের খাওয়ানো চলে। ভাজার পর শস্যের শ্বেতসার সহজপাচ্য হয় বলে বিশ্বাস। কারণ ভাজবার পর শস্যটি ফুলে ফেটে ফেটে যায় যাতে শ্বেতসারের রাসায়নিক জটিল সংমিশ্রণ ছোট-ছোট সরল ভাগে ভেঙ্গে যায়। এমনকি একথাও বলা হয় যে বহুমূত্র রোগী যাদের অতি মণ্ড-শর্করাযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা বারণ তারাও এভাবে শুকনো খোলায় ভাজা শস্য খেতে পারেন। ভাজবার সময় অত্যধিক তাপে ডালের প্রোটিনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অ্যামিনো অ্যাসিড, লাইসিন নষ্ট হয়ে যায়। তথাপি মনে হয় যে ভেজে নিলে ডাল সহজপাচ্য হয় ও তার পৌষ্টিক মূল্য বৃদ্ধি পায়।

ধান কয়েকরকম ভাবে ভাজা হয়। অল্প জলে ভিজিয়ে, বেশ খানিকটা গরম বালিতে ধান নাড়াচাড়া করে ভাজা হয়। ভাজার পর ছাকনিতে বালি ছেঁকে নেওয়া হয়। আর একটি উপায় হল সারারাত গরম জলে ভিজিয়ে রেখে পরদিন একটি গরম লোহার কড়াইয়ে সেই ধান ফুটে না ওঠা পর্যন্ত ভাজতে হয়। তারপর তুষ আলাদা করবার জন্য ধান ভানা হয়। কুটলে ধান চ্যাপ্টা হয়ে যায়, আবার ভেজে তাদের ফোলানো হয়। আবার অনেক সময় জলে ধান সিদ্ধ করে শুকিয়ে, ভেঙে তারপর ভাজা হয়। জোয়ারও এইভাবে ভাজে, কিন্তু

ভাজবার আগের দিন জোয়ারকে গরম জলে ধুয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখতে হয়। বাড়িতেও এই সব শস্য ভাজা যায়। গরম জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর আগুনে চাপানো লোহার কড়াইয়ে খুব গরম ও পরিষ্কার বালিতে অথবা নুনে এসব ভেজে নিতে হয়। ছেঁকে নিলে বালি ও নুন বাররার ব্যবহার করা চলে।

কল বার করানো

প্রাকৃতিক নিয়মে যদি খাদ্যের পৌষ্টিক মূল্য বেড়ে যায় তো তার থেকে ভাল আর কি হতে পারে? শস্যের কল বার করালে এই সুফল পাওয়া যায় কারণ নবোদ্গত চারাটির প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত খাদ্যপ্রাণ প্রাকৃতিক নিয়মেই বীজের মধ্যে তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রকারের শস্য ও ডালের কল বার করে আমরা এই সুফল পেতে পারি। কল-বেরোনো বীজে খাদ্যপ্রাণ 'সি'র পরিমাণ প্রায় দশ গুণের মতো বেড়ে যায় আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থায়ামিন, রিবোফ্লাবিন ও নিকোটিনিক অ্যাসিডের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এর উপর বীজের লোহা, অন্যান্য পৌষ্টিক উপকরণ থেকে আলগা হয়ে যাবার ফলে সহজেই মানবশরীর সেই লোহা গ্রহণ করতে পারে। ডালে কয়েকটি পুষ্টি হানিকর উপাদানও থাকে যা কল-বেরোবার সময় নষ্ট হয়ে যায়।

কল বার করলে বীজের গঠনেও কিছু পরিবর্তন হয়। কল-বেরোবার সময় ডালের খোসা আলগা হয়ে যায় ও ডাল নরম হয়ে যায় বলে সহজেই ডাল সিদ্ধ করা যায়। তা ছাড়া ইচ্ছা করলেই সহজেই ঘষে ডালের খোসা ছাড়ানো যায়। একমাত্র মেথির বেলায় কল বার করলে অন্যান্য সুফলের সঙ্গে যে অতিরিক্ত সুফল পাওয়া যায় তা হল মেথির তেতোভাবটা কমে যায়।

কল বার করা যায় এমন শস্যখাদ্য হল গম, বাজরা, জোয়ার ও রাগী; ডালের মধ্যে কাবুলিছোলা, মুগ, দেশী ছোলা, মটর প্রভৃতি।

সঠিক পরিমাণ জল (প্রতি 100 গ্রাম শস্যর জন্য 50-100 সি সি জল) ব্যবহার করতে হয় যেন 8-16 ঘন্টা ভেজবার পর আর জল অবশিষ্ট না থাকে। তারপর ভেজানো শস্য বা ডাল একটি ভিজে পাতলা কাপড়ে বেঁধে একটি প্লেটে রেখে তার ওপর একটি বাটি উপুড় করে দিন। এবার কল-বেরোবার জন্য 12-24 ঘন্টা সময় দিন। এছাড়া আর একটি পদ্ধতি আছে। ভিজানো শস্যগুলি একটি চালুনির মতো ফুটো পাত্রে (ইডলি বানাবার পাত্রে অথবা ছাকনিতে) পাতলা কাপড়ে ঢেকে দেবেন। কাপড়ের শেষ অংশটা যেন জলে ডুবে থাকে যাতে কাপড়টা সর্বদা ভিজে থাকে।

কল-বেরোনো শস্যখাদ্য ও ডালের পৌষ্টিক মান অধিক মাত্রায় বেড়ে যায় বলে রান্নায় তাদের একটি বিশেষ স্থান আছে। এমন অনেক পদ আছে যাতে কল-বেরোনোর পর শস্যখাদ্য ও ডাল ব্যবহার করলে অপেক্ষাকৃত অধিক সুফল পাওয়া যায়। ঘরে শিশুখাদ্য তৈরি করার জন্য অঙ্কুর-বেরোনো রাগী উৎকৃষ্ট উপকরণ। সাধারণ বাজরার বদলে কল-বেরোনো বাজরার রান্না একটু উন্নত মানের হয়। কোনো-কোনো রান্নায় বেসনের বদলে কল-বেরোনো ছোলার ডালের গুঁড়ো ব্যবহার করা যায় যেমন ভাজা, ইডলি, রাগীপুট্টু, পুরানপোলি প্রভৃতি। ইডলি দোসা, দইবড়া, সম্ভার, লেটো, ঢোকলা (ধোঁকা) ও ডেবরা রুটি প্রভৃতি প্রচলিত খাদ্যে, কলাই, মুগ, অড়হর, মুসুরডাল কল বার করে ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। তালিকা 6.7এ এই সব খাদ্যের মধ্যে কয়েকটি দেখানো হয়েছে। যে কোন পদে কল-বেরোনো শস্য-খাদ্য ও ডাল ব্যবহার করলে ব্যয় না বাড়িয়ে অধিক পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায়।

খাদ্যদ্রব্য গাঁজানো

প্রকৃতি কি ভাবে আমাদের সুবিধা সৃষ্টি করে এটি তার অন্যতম

দৃষ্টান্ত। বেশির ভাগ লোকই জানেন তুধ থেকে কি ভাবে দই তৈরি করা হয়। খাদ্য-বস্তু গাঁজানোর এটি একটি উদাহরণ। ইডলি, দোসা ও আপুম তৈরি করবার জন্য চাল, ডালের যে খামি তৈরি করা হয় সেটি আর একটি উদাহরণ। অনেক শস্য-খাদ্য ও ডালের ভিতর অতি সূক্ষ্ম জীবাণু (micro-organism) থাকে তারাই খাদ্যদ্রব্যকে গাঁজিয়ে তোলে। অনুকূল পরিবেশে এই সব অতি সূক্ষ্ম জীবাণু খুব তাড়াতাড়ি সংখ্যায় বেড়ে যায়। বাড়বার সময় তারা খাদ্যের কতকগুলি উপাদান ব্যবহার করে সেইগুলিকে অন্য পদার্থে পরিবর্তিত করে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় তুধে আমরা যে ল্যাকটোজ নামে শর্করা পাই, দই জমালে সেই ল্যাকটোজ অম্লস্বাদ ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়। শুধু তাই নয় এই সব সূক্ষ্ম জীবাণুগুলি খাদ্যপ্রাণ 'বি'-গোষ্ঠীর অনেক খাদ্যপ্রাণ তৈরি করে। ইডলি, দোসা ও ধোকলা তৈরি করবার সময় গেঁজে-ওঠা বাটা ডালের মিশ্রণে যে পরিবর্তন হয় তা চাল, ডালের মধ্যেকার এনজাইমের জন্য হয়। এই মিশ্রণটি ভিজে অবস্থায় ফেটালে তার ভেতর হাওয়া ঢোকে। চাল ও ডালের মধ্যস্থিত এনজাইম শ্বেত-সারের সঙ্গে মিশে কার্বন-ডায়োক্সাইড (carbon dioxide) গ্যাস তৈরি করে যার ফলে মিশ্রণটি ফেঁপে ওঠে ও তার মধ্যে বুদ্‌বুদ্‌ দেখা দেয়। তারপর এই মিশ্রণটি ভাপে জমালে (ইডলি ও ধোকলা) অথবা চাটুতে ভাজলে (দোসা) আমরা এমন রাঁধা খাবার পাই যার গায়ে ছোট-ছোট ছিদ্র থাকে। পশ্চিম ভারতের সর্বজনপ্রিয় খাদ্য খামাম তৈরি করতে হলে প্রথমে কাবুলিছোলা বাটা গাঁজিয়ে ভাপে বসাতে হয়।

খাদ্যদ্রব্য গাঁজানোর অনেক পৌষ্টিক মূল্য আছে। কল বার করার মতো খাদ্যকে গাঁজালেও অনেক সময় তার মধ্যস্থিত থায়ামিন, রিবোফ্লাবিন ও নিকোটনিক অ্যাসিডের (এগুলি সবই 'বি' গোষ্ঠীর খাদ্য-প্রাণ) পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তা ছাড়া খাদ্যের ভেতরে যে লোহা থাকে

শরীর তা সহজেই গ্রহণ করতে পারে। গাঁজাবার সময় যে এনজাইম তৈরি হয় তা শরীরের পক্ষে উপকারী, গাঁজানো উপকরণে প্রস্তুত খাদ্য খেলে আমরা সেই এনজাইমগুলি পাই। বিশেষ করে বলা হয় যে দই ক্ষুদ্রান্ত্রে কতগুলি ব্যাকটেরিয়া যোগায় যা শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় কতগুলি খাদ্যপ্রাণ তৈরি করে নেয়। গাঁজানো খাদ্যদ্রব্য-গুলি নরম ও তরল পদার্থ শুষে নেবার মতো (spongy) হয় এবং শিশুরাও খেতে পছন্দ করে। এনজাইমগুলি কোষসমূহ ভেঙে ফেলবার সহায়তা করে বলে শ্বেতসার ও প্রোটিন সহজপাচ্য হয়। গেঁজে ওঠবার সময়েই, মনে হয় পৌষ্টিক উপাদান-গুলির পরিপাক-ক্রিয়ার পূর্বের কাজ কিছু পরিমাণে চলতে থাকে।

চুন-মেশানো

আমরা তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি যে বেশির ভাগ ভারতীয় খাদ্যতালিকায় ক্যালসিয়াম বা চুনের অংশ কম। শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মা, যাদের ক্যালসিয়ামের চাহিদা একটু বিশেষ ধরনের, তাদের খাবার থেকে যেটুকু তাঁরা পান তার বেশি ক্যালসিয়াম দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়েরা একসঙ্গে বসে গল্প করেন ও পান খান। পানপাতায় অধিক মাত্রায় ক্যালসিয়াম থাকে (প্রতি 100 গ্রামে 230 মিলিগ্রাম) আরো থাকে লোহা (7 মিলিগ্রাম), খাদ্যপ্রাণ 'সি' (5 মিলিগ্রাম) ও বিশেষ করে বিটা-ক্যারোটিন (beta carotene) 6000 মিলিগ্রাম, এ উপাদানটিকে আমাদের শরীর খাদ্যপ্রাণ 'এ'তে পরিবর্তিত করে। পানে চুন (calcium hydroxide) লাগিয়ে খেলে ক্যালসিয়াম খাওয়ার মোট পরিমাণ বেড়ে যাবে। ছটি পানে চুন লাগিয়ে খেলে 300 সি সি দুধপানের সমান ক্যালসিয়াম পাওয়া যাবে।

আমাদের খাবারেও চুন মেশানো যায়। অম্লজাতীয় খাদ্য যেমন,

ঘোল, রসম্, ইডলি, দোসা ও ধোকলা তৈরি করবার খামি প্রভৃতিতে চুন মেশালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চুন ক্ষারীয় পদার্থ বলে যে সব খাদ্যদ্রব্য টক্ অথবা অ্যাসিডজাতীয় নয়, তাতে মেশালে 'বি'-গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ থায়ামিন ও রিবোফ্লাবিনকে নষ্ট করে দেয়। এরূপ খাদ্য-দ্রব্যে 200 গ্রাম প্রতি অনধিক এক গ্রাম চুন মেশালে তার পৌষ্টিক মূল্য বাড়ে কিন্তু রাঁধা খাবারের স্বাদ ও গন্ধে কোন পার্থক্য হয় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অপুষ্টিকর খাদ্যজনিত রোগ

উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য না পেলে মানুষ দুর্বল, রোগা ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে এ কথা আমরা সকলেই বুঝতে পারি। কয়েকটি খাদ্য সম্বন্ধে সময়ে সময়ে আমরা হয়তো একটা ভাসাভাসা ধারণা করে নি যে এই খাদ্য বলকারক কিংবা চোখের পক্ষে অথবা মাথার পক্ষে ভালো। স্বাস্থ্যহীনতা বা শরীরের কোন কষ্টের কারণ সাধারণত আমরা রোগের ছোঁয়াচ লেগে হয়েছে বলে ভাবি, খাদ্যের ত্রুটি বলে মনে করি না। আমরা স্বাস্থ্যহীনতাকে একটা অসুখ বলে মেনে নিই।

খাদ্যে পুষ্টির অভাব ঘটলে শরীরে নানা প্রকার কষ্ট দেখা দেয়। তালিকা 1.1এ (প্রথম পরিচ্ছেদ) বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণ আমাদের শরীরের কি ভাবে পুষ্টিসাধন করে ও তাদের অভাব ঘটলে কি শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয় তা বিশদভাবে বলা হয়েছে। যেমন খাদ্যপ্রাণ 'এ'-র অভাবে স্বল্পালোকে দেখতে কষ্ট হয় এমন কি মানুষ অন্ধও হয়ে যেতে পারে। আবার 'বি'-গোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাণ নিয়াসিনের অভাব হলে চামড়া লাল হয়ে যায় ও চুলকায়, পেলেগ্রা (pellagra) বলা হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে এক সময় পেলেগ্রাকে সংক্রামক রোগ বলা হত। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যে সমস্ত অপুষ্টি-জনিত রোগ দেখা দেয় তার

তালিকা খুবই দীর্ঘ। এই পরিচ্ছেদে তাদের মধ্যে মুখ্য কয়েকটি রোগ যা ভারতীয়দের সাধারণত হয়ে থাকে— তারই আলোচনা করা হবে। খাদ্যে পুষ্টিহীনতার মূল কারণ স্বল্প আয়। তা হলেও এই সীমিত আয়ের মধ্যেই, পুষ্টিবিজ্ঞানের জ্ঞানের দ্বারা সস্তা অথচ ভালো খাবার বেছে, খাদ্য ও রাঁধবার কায়দা বদলে, খাবারের পৌষ্টিক উন্নতি করা সম্ভব। সপ্তম পরিচ্ছেদে উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একথা মনে রাখার বিশেষ প্রয়োজন যে অপুষ্টিজনিত রোগ খাদ্য ছাড়া অন্য কারণে দেখা দিতে বা বেড়ে যেতে পারে। যেমন দীর্ঘদিন উদরাময় রোগে ভুগলে খাবার ভালো হজম হয় না ও খাওয়ার পর তার অধিকাংশই জল হয়ে বার হয়ে যায়, এর ফলে শরীরে অপুষ্টিজনিত লক্ষণসমূহ খুব তাড়াতাড়ি দেখা দেয়। খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হলে তার নিজের যা কুফল হবার তা ত হবেই তাছাড়া আমাদের শরীর খাদ্যপ্রাণ 'এ' পূর্ণভাবে গ্রহণ করে শরীরগঠনের কাজে লাগাতে পারে না। কয়েকপ্রকার রক্তশূন্যতায় শরীর খাদ্যপ্রাণ বি$_{12}$ ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে না, আবার হুক-ওয়ার্ম হলে শরীর লোহা গ্রহণ করতে পারে না। জ্বর হলে শরীর খুব তাড়াতাড়ি খাদ্যকে জ্বালিয়ে দেয় তাই বেশি খাদ্যের প্রয়োজন। এদিকে জ্বর হলে খিদে থাকে না কাজেই খাওয়ার মাত্রাও কমে যায়।

ক্যালরি ও প্রোটিনের ঘাটতি

কতকগুলি ভারতীয় খাদ্যে ক্যালরি কম থাকে এবং প্রোটিনও কোন রকমে মাত্রার কাছাকাছি পৌঁছায়। রোজ এই ধরনের খাদ্য গ্রহণ করলে বয়স্কদের ওজন কমে যায়, শরীরের বাড় কমে যায়, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ও দৈহিক ও মানসিক কাজে উৎসাহের অভাব দেখা যায়। আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে পুষ্টিহীন খাদ্য শিশুদের অধিক ক্ষতিকারক কারণ, তাতে কেবলমাত্র তাদের দেহের বিকাশ বাধা পাবে

তা নয় সত্যকারের অপুষ্টিজনিত রোগের লক্ষণসমূহ দেখা দেবে। এই দুইপ্রকার রোগের লক্ষণ স্পষ্ট ধরা যায় আর সাধারণত একটি রোগের লক্ষণ আর একটির সঙ্গে প্রকাশ পায়। একটি রোগের নাম ম্যারাসমাস (marasmus)। খাদ্যে প্রোটিনের মাত্রা যথাসম্ভব ঠিক থাকলেও যদি ক্যালরির ঘাটতি থাকে তাতে এই রোগ হয়। এতে শিশুর বাড় থাকে না, পেশী দুর্বল ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, চামড়া পাতলা ও বুড়ো মানুষের চামড়ার মতো কুঁচকিয়ে যায়। অন্য রোগটির নাম হল 'কোয়াশিওরকর (kwashiorkor)। এটি আফ্রিকার ভাষার একটি শব্দ যার অর্থ হল স্থানচ্যুত শিশু। এরকম নামকরণের উদ্দেশ্য সাধারণত পরের সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হবার পরই প্রথমটির এই অবস্থা হয়। দ্বিতীয় সন্তানটি আসার পর আগেরটি মাতৃদুগ্ধ হতে বঞ্চিত হয় ও তার বদলে সে যা খাদ্য পায় তা প্রয়োজন অনুপাতে কম। খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ খুব কমে গেলে এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়। শিশুর মাথার চুল লাল হয়ে যায় ও কমে যায়। চামড়া এরকম ফেটে যায় মনে হয় পুড়ে গেছে। পেশী দুর্বল হয়ে পড়ে, রস জমে পা ফুলে যায়। এ সব শিশু ঘ্যানঘ্যানে হয়, হাসিখুশি থাকে না, খিট্‌খিটে ও নির্বোধের মতো হয়ে যায়, হাঁটতে চেষ্টা করে না। অল্প আহার আর তার উপর পেটের অসুখ সাধারণত শিশুদের পক্ষে আরও জটিলতার সৃষ্টি করে। পেটের অসুখ হলে, ভুল ধারণার বশে অনেক সময় শিশুকে কিছু খেতে দেওয়া হয় না, ফলে সে আরও স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ে। সব থেকে দুঃখের বিষয়, যে সব শিশু উপযুক্ত পরিমাণে ক্যালরি ও প্রোটিন পায় না, পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে তাদের বুদ্ধির বিকাশ ভালো হয় না এবং শেখবার ক্ষমতা চিরদিনের মতো কমে যায়।

অপুষ্টি এই রোগের মূল। সুতরাং এই রোগের চিকিৎসা মূলত খাদ্যের উপর নির্ভর করে। খুব সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়, ঘনীভূত কিন্তু সহজপাচ্য খাদ্য দেওয়া হয় যাতে ক্যালরি ও প্রোটিন অধিক পরিমাণে

থাকে। এই রকম খাদ্য দু-তিনদিন দেওয়া হয় যাতে শিশু সামলে ওঠে, তারপর তার স্বাভাবিক খাদ্য চলতে থাকে। আর একটি চিকিৎসাপদ্ধতি হল উপযুক্ত পরিমাণে সুষমখাদ্য দেওয়া এবং শিশু সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো। বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে, শিশুকে যে খাদ্যের মিশ্রণটি খাওয়ানো হবে তাতে যেন প্রোটিনের পরিমাণ ভালো থাকে (শতকরা 15-20 ভাগ)। এই প্রোটিন উচ্চমানের হওয়া দরকার (স্কিমড মিল্ক পাউডার অথবা মিশ্র সব্জীর প্রোটিন), তা ছাড়া শিশুর খাদ্যে যেন প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ-পদার্থসমূহ থাকে। যে কোন রোগের ছোঁয়াচ বিশেষ করে জ্বর ও পেটের অসুখ থেকে শিশুকে সাবধানে রাখা দরকার যাতে সে খাদ্যের থেকে পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে।

দৃষ্টিহীনতা

একথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে খাদ্যে কোন পৌষ্টিক উপাদানের ঘাটতি হলে সত্যি সত্যি লোক সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। বাস্তবিকই খাদ্যে, খাদ্যপ্রাণ 'এ' অথবা তারই অনুরূপ, পীত-পোষ্টাই (হলদে রঙের সব্জী ও ফলে যে হলুদ পদার্থ পাওয়া যায় তাকে ক্যারোটিন বলে, আমরা এ বিষয়ে 1ম ও 2য় পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি), কম থাকলে শিশুরা অন্ধ হয়ে যায়। ভারতবর্ষে এটা এমন কিছু অসাধারণ ঘটনা নয়। অনুমান করা হয় ভারতবর্ষে দশ লাখ অন্ধ লোকের মধ্যে অনেকে শৈশবেই খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ 'এ'-র অভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে।

প্রথমে চোখের সাদা অংশের স্বচ্ছ আবরণটি বিবর্ণ, অস্বচ্ছ, শুকনো হয় ও তার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়। সেই সঙ্গে শিশুটির সন্ধ্যার সময় দেখতে কষ্ট হয়। একে 'রাতকানা' বলা হয়। এর লক্ষণ শিশু তার থালায় দেওয়া খাবার হাতড়াতে থাকে। এই অবস্থায়

খাদ্যপ্রাণ 'এ' খাওয়ালে শিশু তার স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। কিন্তু উপেক্ষা করলে চোখের মধ্যবর্তী স্বচ্ছ অংশটিও অস্বচ্ছ হয়ে আসবে ও শিশুটি চিরদিনের মত তার দৃষ্টিশক্তি হারাবে। অবহেলা করলে, পরে হয়তো চোখের লেন্সের স্বচ্ছতাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

যে সব খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ 'এ' আছে শিশুকে সে সব খাদ্য খাইয়ে অথবা খাদ্যপ্রাণ 'এ'র পুরোভাগে যে পীত-পোষ্টাই থাকে তা খাইয়ে, খাদ্যপ্রাণ 'এ'র ঘাটতি পূরণ করা যায়। এই শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে শাকপাতা সব থেকে সস্তা। দিনে 50 গ্রাম শাক খেলেই এই সঙ্কট থেকে রক্ষা পাবে। যদি গর্ভবতী মায়েরা প্রতিদিন 100 গ্রাম শাক খান তা হলে শিশুর জন্মকালে, তার ব্যবহারের উপযোগী আগামী কয়েক মাসের মতো খাদ্যপ্রাণ 'এ' তার যকৃতে সঞ্চিত থাকবে। হাঙ্গরের যকৃতের তেল খাদ্যপ্রাণ 'এ'র ঘনীভূত উৎস, সে কারণে শিশু অথবা তার মার প্রতিদিন কয়েকফোঁটা হাঙ্গরের যকৃতের তেল খেলেও উপকার হবে। শিশুদের বছরে দুবার অধিক পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ 'এ' খাওয়ানো, তার স্বাস্থ্যরক্ষার আর একটি উপায় বলে সুপারিশ করা হয়। এর ফলে, খাদ্যপ্রাণটি শিশুর যকৃতে সঞ্চিত হয় ও পরবর্তী কয়েকমাস ধরে এর থেকে একটু-একটু করে শিশুর শরীর তা গ্রহণ করে।

রক্তশূন্যতা

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমাদের আহারে লোহার পরিমাণ কোনোক্রমে প্রয়োজনের মাত্রার কাছাকাছি থাকে। খাদ্যের যেটুকু পরিমাণ লৌহ আমরা খাই হয়তো আমাদের শরীর বেশির ভাগ সময় গ্রহণ করতে পারে না কারণ তা 'ফাইটাটেস' (phytates) নামক একটি পদার্থের সঙ্গে জড়িত থাকে। এই ফাইটাটেস সব শস্যখাদ্যেই, বিশেষ করে গম, জোয়ার ও রাগীতে থাকে আর ভারতবাসীর খাদ্যে শস্যখাদ্যের

পরিমাণ থাকে বেশি। ডালে প্রচুর পরিমাণে ফাইটাটেস থাকে। তার ওপর লোহা ঠিকমত শরীরে শোষণ করাবার জন্য খাদ্যপ্রাণ 'সি' ও প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। সাধারণত ভারতবাসীর আহারে এই দুটি পৌষ্টিক উপাদানই প্রয়োজন অপেক্ষা কম থাকে। কৃমির ফলে রক্তক্ষয় হওয়া শরীরে লোহা না থাকার আর একটি কারণ। এদেশে প্রায় প্রত্যেকেরই কৃমি থাকে। আর শিশু থেকে বয়স্কলোক পর্যন্ত সকলেই প্রায়ই লোহার ঘাটতির জন্য রক্তশূন্যতায় ভোগে। এই রোগের লক্ষণ হল চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, হাঁপধরা, ক্ষুধামান্দ্য ও ক্লান্তি। লোহা বেশি আছে এমন খাদ্য যেমন শাক ও ডাল প্রতিদিন খেলে এই রোগের আক্রমণ কম হতে পারে।

আমাদের দেশের জনসাধারণ আর এক প্রকারের রক্তশূন্যতায় ভোগে, যাকে 'মেগালোব্লাস্টিক' (megaloblastic) রক্তশূন্যতা বলে। খাদ্যে, খাদ্যপ্রাণ বি$_{12}$ অথবা ফলিক অ্যাসিড অথবা দুটিরই অভাবে এই রোগ হয়। শেষোক্ত পৌষ্টিক উপাদানটি টাটকা শাকসব্জী থেকে পাওয়া যায়, আর খাদ্যপ্রাণ বি$_{12}$ আমরা মাংস, ডিম ও যকৃৎ থেকে বেশি পাই। কিন্তু জৈব খাদ্য সংগ্রহ করা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই সাধ্যের বাহিরে। প্রতিদিন 100 সি সি দুধ কিংবা ঘোল খেলে আমরা প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ বি$_{12}$ পাব।

ঋতুকালে স্ত্রীলোকের শরীরের লোহা উপাদানটি বেরিয়ে যায় সেজন্য তাদের বিশেষ করে লোহার চাহিদা বেশি। স্ত্রীলোকেরা আর একপ্রকার রক্তশূন্যতায় ভোগেন, গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা এই রক্তশূন্যতার ফলে আরও স্বাস্থ্যহীনা হয়ে পড়েন। এই ধরনের রক্তশূন্যতা বেড়ে গেলে, গর্ভাবস্থায়, বা স্তন্যদানকালে মা আরও দুর্বল হয়ে পড়বেন এমন কি তার প্রাণহানিও ঘটতে পারে। এই রোগের প্রধান কারণ হল মায়ের খাদ্যে লোহার ঘাটতি, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শেষের 100 দিন। খাবারের দ্বারা প্রয়োজনীয় লোহার চাহিদা পূরণ

হয় না বলে ডাক্তারেরা এই সময় ফলিক অ্যাসিডযুক্ত আয়রন ট্যাবলেট খাবার নির্দেশ দেন। যদি গর্ভবতী মা নিয়মিত কোন হাসপাতালে দেখাতে যান তা হলে সেখান থেকেই এই ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তারা সাধারণত এই সময়ে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেন না।

মায়ের দুধ ও পশুর দুধ, দুই প্রকার দুধেই লোহার পরিমাণ কম থাকে। যে-সব শিশু শুধু দুধই খায় তাদেরও রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে যদি তাদের শরীরে সঞ্চিত লোহা কম থাকে। সেইজন্য যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তাদের খাদ্যে এই পৌষ্টিক উপাদানটির ঘাটতি পূরণ করা উচিত। লোহা বেশি আছে, এমন খাদ্য যেমন টাটকা শাকসব্জী, রাগী ও সুসিদ্ধ ডাল চটকে শিশুকে খাওয়ানো দরকার।

বি-কমপ্লেক্স-বিহীন জীবন

খাদ্যে, বিশেষ করে শিশুদের, 'রিবোফ্লাবিন' (খাদ্যপ্রাণ বি$_1$)-এর ঘাটতি হলে মুখে ও জিভে ঘা হয়, ঠোঁটের দুপাশ ফেটে যায় ও চোখের পাতা খসখসে হয়ে যায়। থায়ামিন (খাদ্যপ্রাণ বি$_2$) কম-এর লক্ষণ ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা, তার সঙ্গে বমির ভাব, খিটখিটে স্বভাব ও নৈরাশ্য ; এ থেকে বেরিবেরি রোগ পর্যন্ত হতে পারে। বেরিবেরি রোগ দু রকমের হয়। এক হয় শুকনো ধরনের, এতে হাত-পা শুকিয়ে যায় ও হাত-পা অসাড় হয়ে যায়, আর অন্য প্রকারের হয় রসস্থ, তাতে হাত-পা ফুলে যায়। বেরিবেরি সাধারণত সেই সব অঞ্চলে হয় যেখানকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য কলে-ছাঁটা চাল, কারণ কলে-ছাঁটা চালের খাদ্যপ্রাণ তুষের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। প্রসূতি ও পোয়াতি মায়েদের বেরিবেরি সহজেই আক্রমণ করে। মায়ের দুধে থায়ামিন কম থাকলে স্তন্যপায়ী শিশুরও অপুষ্টিজনিত এই রোগ হতে পারে। সাধারণত শিশুর হঠাৎ এই রোগ হয় ও তাতে শিশুটি শীঘ্র মারা যায়। ডাল,

চিনাবাদাম ও আছাঁটা শস্যখাদ্য হল এই খাদ্যপ্রাণটির উৎস। খাদ্যে 'বি'-গোষ্ঠীর আর একটি খাদ্যপ্রাণ নিয়াসিন কম থাকলে যে-সব লক্ষণ দেখা দেয় তাকে এককথায় 'পেলাগ্রা' (pellagra) বলা হয়। এতে চামড়া শুকিয়ে যায়, তাতে আঁশের মত হয় ও ফুলে ওঠে। যে সব অঞ্চলের প্রধান খাদ্য জোয়ার, পেলাগ্রা সেই সব অঞ্চলে বেশি হয়। মিশ্র শস্যখাদ্য ও ডাল খেলে এই রোগনিবারণ করা যায়। চিনাবাদামে নিয়াসিন ও প্রোটিন দুই পাওয়া যায় কাজেই এই রোগ সারাবার একটি সম্ভাব্য পৌষ্টিক উপায় হল চিনাবাদাম খাওয়া।

পঙ্গু অবস্থা

মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের অনেক জায়গায় খেঁসারির ডাল বেশি খাওয়া হয়। এই ডাল খেলে বিশেষ করে যুবকদের পা ধীরে ধীরে ও চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থাকে ইংরেজিতে ল্যাথিরিজম (lathyrism) বলে। এই সব যুবকদের ক্রাচে ভর দিয়ে কোন রকমে খুঁড়িয়ে হাঁটা চলা করতে দেখলে কষ্ট হয়। দেখা গেছে খেঁসারির ডাল গরম জলে ভিজিয়ে রোদে শুকিয়ে নিলে তার বিষ নষ্ট হয়ে যায়। তখন এই ডাল খেলে ল্যাথিরিজম হবার ভয় থাকে না। খেঁসারির ডাল খাওয়ার চিরস্থায়ী ও সাংঘাতিক ফল বিবেচনা করলে মনে হয় খেঁসারির ডালের চাষ বন্ধ করা খুবই যুক্তিসঙ্গত। এই ডালের বদলে অন্য ডাল খাওয়া উচিত।

গলগণ্ড

হিমালয়ের পাদদেশে কয়েক জায়গায় খাবার জলে প্রয়োজন মতো আয়োডিন থাকে না। এর ফলে গলার মধ্যেকার থাইরয়েড-গ্রন্থী ফুলে ওঠে এবং চোখ দুটি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসে, এই অবস্থাকে বলা হয় গলগণ্ড। এই বিশ্রী অবস্থা সকলেরই এমন কি মায়ের দুধ খায় এমন

ছোট শিশুরও হতে পারে। সেই সব জায়গায় গলগণ্ড রোগ বেশি দেখা যায় যেখানে অনেক লোকই দেখা গেছে ক্রেটিন (cretin)-ভুক্ত। ক্রেটিন কথার অর্থ হল এমন মানুষ যার দৈহিক ও মানসিকবিকাশ পূর্ণতা পায় নি। অনেক লোক আবার বোবা ও কালা। এক ভাগ আয়োডিন পটাসিয়াম আয়োডেটরূপে (potassium iodate) 10,000 ভাগ সাধারণ নুনের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে এই দুঃখদায়ক রোগ নিবারণ করা যায়। এই রোগ-অধ্যুষিত অঞ্চলে এইরকম আয়োডিন মিশানো নুন চালু করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

ছাতাধরা দাঁত

দাঁতের উপরের সাদা কলাই অর্থাৎ শক্ত আস্তরণটি ঠিক রাখার কাজে খনিজপদার্থ ফ্লুওরিন-এর একটি ভূমিকা আছে। যদি জলে প্রতি মিলিয়নে 2 ভাগের বেশি ফ্লুওরিন থাকে, যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কয়েকটি জায়গায় আছে, সেই জল পান করলে দাঁতে নানা রঙের অথবা সাদা ছাতলা পড়ে। এই রোগটিকে বলা হয় ফ্লুওরসিস। এর কারণ, দাঁতে ক্যালসিয়াম ঠিক মতো শক্ত হয়ে কলাই-এর মতো জমতে পারে না। আশ্চর্যের কথা জলে ফ্লুওরিন কম থাকলে তা আবার দাঁতের অন্যরকম ক্ষতি করে। এতে দাঁতে ফুটো দেখা দেয় ও ভালো দাঁতে ক্ষয় ধরে, ছোট দাগ বা ফুটো হয়। অবশ্য দাঁতে ক্ষয় ধরার সাধারণ কারণ বিশেষ করে শিশুদের বেশি চট্‌চটে মিষ্ক অথবা চকোলেট খাওয়া। এইসব, দাঁতের ফাঁকে জমে থাকে ও সেখানে ব্যাকটেরিয়া জন্মিয়ে দাঁতের ক্ষয় ধরায়। এই ক্ষয় নিবারণের উপায় হল প্রত্যেকবার খাওয়ার পর ভালো করে মুখ ধোওয়া। এদেশে প্রচলিত এই সাধারণ অভ্যাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হাতের বদলে এখন কাঁটাচামচ দিয়ে খাওয়া হচ্ছে যার ফলে খাওয়ার পর হাত মুখ ধোওয়া ও কুলকুচো করার দরকার হয় না আর তা করাও হয় না।

উপসংহার

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে প্রতিটি খাদ্যপ্রাণের ও খনিজ পৌষ্টিক উপাদানের ঘাটতি থেকে স্বাস্থ্যহীনতা অর্থাৎ অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা দেয়। যেমন খাদ্যপ্রাণ 'ডি'-র অভাবে 'রিকেট্স' হয়। এতে দুটো পা দুর্বল হয়ে বেঁকে যায়। খাদ্যপ্রাণ 'সি'র অভাবে স্কার্ভি হয়। এতে দাঁতের মাঢ়ী ফুলে ওঠে ও মাঢ়ী দিয়ে রক্ত পড়ে, হাত ও শরীরের বড়ো-বড়ো সন্ধিস্থলে বেদনা হয় ও এসব জায়গা দুর্বল হয়ে পড়ে। এদেশে অন্যান্য অপুষ্টিজনিত রোগ, যাদের বিষয় এই পরিচ্ছেদে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, তার তুলনায় বিশেষ করে এই দুটি রোগের, বাড়াবাড়ি বিশেষ দেখা যায় না।

নবম পরিচ্ছেদ

বিশেষ খাদ্য

যখন অল্প আহার গ্রহণ করার ফলে কোন পৌষ্টিক উপাদানের অভাব ঘটে এবং প্রত্যক্ষভাবে তা থেকে শরীরে কোন অসুখের সৃষ্টি হয়, তখন আহারের কিছু পরিবর্তন করে সেইসব পৌষ্টিক উপাদানগুলির সরবরাহ ঠিক রাখলে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়, অষ্টম পরিচ্ছেদে দৃষ্টান্ত দিয়ে তা বোঝানো হয়েছে। যদি এমন হয় যে পৌষ্টিক উপাদানের স্বল্পতা নয়, শরীরের অন্য কোন ত্রুটি সেই অসুখের কারণ, তা হলেও নিয়মিত আহারের কিছু তারতম্য করলে অনেকটা সুফল পাওয়া যায়। যেমন বহুমূত্র রোগ। কয়েক প্রকার শারীরিক পীড়া, দীর্ঘকালের পুরানো অসুখ, যেমন পাকস্থলীর ঘা, উদরাময়, দেহের ওজন-আধিক্য অথবা শুধু জরা এসবের সঠিক কারণ নির্ণয় করে যদি আহারের কিছুটা অদল-বদল করা হয় তাতে সুফল পাওয়া যায়। এই পরিচ্ছেদে আমরা এখন কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করবো।

বহুমূত্র রোগ

1. দেহে শ্বেতসারের ব্যবহার ও বহুমূত্র রোগের মধ্যে একটি প্রাথমিক সম্বন্ধ আছে। আমরা চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখেছি যে শ্বেতসারই

গ্লুকোজে পরিণত হয়। অগ্ন্যাশয়ে ইন্সুলিন নামক একরকম রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হয়, যার কাজ রক্তপ্রবাহে যে গ্লুকোজ থাকে তাকে গ্লাইকোজেন নামক পদার্থে পরিবর্তিত করা। এভাবে গ্লাইকোজেন দেহের পেশীতে জমা থাকে। কিন্তু যদি ইন্সুলিনের মাত্রা কম পড়ে তখন প্রথমে রক্তে ও পরে মূত্রে গ্লুকোজ থেকে যায়, তার আর পরিবর্তন হয় না। এর ফলে বহুমূত্র রোগীর জড়তার সৃষ্টি হয় ও শেষ পর্যন্ত সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও বহুমূত্র রোগীর দেহ, স্নেহপদার্থের সদ্ব্যবহার করতে পারে না।

2. 'ইন্সুলিন ইনজেকসন নিলে অথবা কেবলবাত্র ইন্সুলিন খেলেও বহুমূত্র রোগীর কিছুটা উপকার হয়, তখন তাহার প্রাত্যহিক আহারের সামান্য অদল-বদল করে নিলে কাজ চলে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইন্সুলিনের ব্যবহার ও আহারের রকমফের একইসঙ্গে করা হয়। কিন্তু 'ইন্সুলিন' একেবারে বাদ দিলে আহারের পরিবর্তনের প্রয়োজন উপেক্ষা করা চলে না।

3. চিনি খাওয়ার পরিমাণ অনেক কমাতে হবে, একেবারে বাদ দিলে খুবই ভালো হয়। কৃত্রিম মিষ্টিকারক, বড়ি ও তরল, এ দুরকমই পাওয়া যায়। এ দিয়ে চা, কফি, ঘরে তৈরি মিষ্টি-খাবার করা যায়। বহুমূত্র রোগীর পক্ষে যদিও বেশ শক্ত তা হলেও তাঁরা যখন কারো সঙ্গে দেখা করতে যাবেন অথবা রেস্তোরাঁতে খাবেন তাঁরা যেন মিষ্টির লোভ সংবরণ করেন।

4. চাল, গম ও ঐ শ্রেণীর শস্যখাদ্য থেকে শ্বেতসারের উৎপত্তি। কাজেই যতটা সম্ভব এ সব কম খাওয়া ও সেই সঙ্গে প্রোটিন খাদ্য প্রধানত ডালের মাত্রা বাড়ানো ভালো। শ্বেতসার ও প্রোটিনের সাধারণ অনুপাত 5 ও 1 থেকে কমিয়ে 3 ও 1এ রাখতে হবে। সপ্তম পরিচ্ছেদে খাদ্যবস্তুকে শুষ্ক করার কথা বিশদ্‌ভাবে বলা হয়েছে। খাবার শুকিয়ে নিলে তার শ্বেতসার বহুমূত্র রোগীর গ্রহণযোগ্য হয়। আমরা

সাধারণত চাল, গম প্রভৃতি শস্যখাদ্য প্রতিদিনের পুরোমাত্রা এক বা দুবারে খাই। হজম করার কাজ সহজ হবে যদি দিনে প্রধান আহার ও জলযোগের মধ্যে ভাগাভাগি করে কয়েকবারে তা খাওয়া হয়।

5. যে খাদ্যে শ্বেতসারের তুলনায় প্রোটিন বেশি তা পরিমাণে বেশি খেতে হবে। মাংস (সবরকম), মাছ ও ডিমে অতিমাত্রায় প্রোটিন থাকে, আর শ্বেতসার থাকে না বললেও হয়। খাবার জিনিস যেমন চিনাবাদাম, নানারকম বাদাম, নারকোল, দুধ, দই, পনির বা ছানা, শাকপাতা ও অন্যান্য সব্জী যেমন ডাঁটা, ফুলকপি, টমেটো এ সবে প্রোটিনের অনুপাতে শ্বেতসার খুব কম পরিমাণে থাকে, কাজেই যতটা সম্ভব এই শ্রেণীর খাদ্য বহুমূত্র রোগীর সচরাচর খাওয়া উচিত।

6. এ ছাড়া মণ্ড-শর্করাযুক্ত খাদ্য যেমন চাল, আলু ও নানাপ্রকার মূলজাতীয় খাদ্য (মিষ্ট আলু, চুপড়ি আলু ও কচু) বেশির ভাগ ফল বিশেষ করে কলা, শুকনো ফল (যাতে শ্বেতসার ও শর্করা ঘনীভূত থাকে), বীট, মূলো ও পেঁয়াজ—এ সব খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। তবে কয়েকরকম ফল যেমন তরমুজ, পেঁপে, ডালিম, কমলা বা ঐ জাতীয় লেবুর রস ছিবড়া না রেখে ছেঁকে খাওয়া চলে।

7. প্রয়োজন মত পৌষ্টিক উপাদান পেতে হলে কয়েকপ্রকার খাবার মিলিয়ে খেতে হবে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 6.7 তালিকায় খাদ্যমিশ্রণ দেখানো হয়েছে। চাল প্রভৃতি শস্যখাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে ডালের পরিমাণ বাড়াতে হবে ও ভাতের পরিবর্তে রাগী ও আটা খেতে হবে।

8. অনেক সময়ে বহুমূত্র রোগীর অধিক রক্তচাপ, ওজন-আধিক্য ও হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা প্রভৃতি জটিলতা দেখা দেয়, তাই বহুমূত্র রোগীর কিছুটা পরিমাণ স্নেহজাতীয় পদার্থ খাওয়া দোষণীয় ; না হলেও এদের ঘি ও মাখন বন্ধ করে তরল রান্নার তেল ব্যবহার করলে উপকার হবে। কারণ ঘি ও মাখনে 'কোলসটেরল' বেশি থাকায় 'অ্যাথেরোস্লিরোসিস'

উপসর্গের সৃষ্টি করে। মাংস ও ডিমে চর্বিজাতীয় পদার্থ থাকে সুতরাং চর্বি ছাড়া প্রোটিন পেতে হলে মুর্গিশাবক ও সেসব মাছ খাওয়া দরকার যার মধ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে না। রক্তের চাপ বেশি থাকলে রান্নার সময়ে অথবা রান্না করা খাবারে যতটা পারা যায় নুন ব্যবহার কমাতে হবে।

পাকস্থলী ও অন্ত্রের ঘা

1. অনেকের পাকস্থলীতে অধিকমাত্রায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড জন্মায়—তাতে তাদের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু কারো-কারো বেলায় চিন্তা ও মানসিক অবসাদ, ধূমপান, মদ্যপান, চা ও কফি পান ও অতিরিক্ত মশলা দিয়ে তৈরি খাদ্যগ্রহণ করলে এই অ্যাসিড ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। এই অ্যাসিডে পাকস্থলীর ভিতরের আস্তরণ জীর্ণ করে দেয় যার ফলে তাতে অ্যাসিড এসে পড়লে জ্বালা করতে থাকে।

2. একথা স্পষ্ট যে এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে, অভ্যাস ও খাদ্য-জনিত কারণ যেমন ধূমপান, মদ্যপান, চা ও কফি পান ও অতিরিক্ত মশলা দেওয়া খাবার ত্যাগ করতে হবে। ভাল করে চিবিয়ে আস্তে আস্তে খেতে হবে যাতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়তে না পারতে।

3. ভালো ফল পেতে হলে ঐ সঙ্গে ভাজা অথবা মোটা ও দুষ্পাচ্য খাবার যেমন ভাজা ছোলা, মটর ও বাদাম ও বীজওয়ালা পেয়ারার লোভ ছাড়তে হবে।

4. দুধ, দুধের মাঠা ও ডিম এদের পক্ষে উপকারী। বাস্তবিক কম পরিমাণে ও বারে বারে, মাঠা না তোলা দুধ পান করলে এরা সুফল পাবেন কারণ তাতে পাকস্থলী কোনো সময়ে খালি থাকবে না আর দুধের স্নেহজাতীয় পদার্থ অ্যাসিডের জ্বালা কমিয়ে রাখে। তবে ওজন-আধিক্য অথবা বহুমূত্র প্রভৃতির জটিলতা থাকলে বেশি পরিমাণে

দুধ পান করলে তা থেকে অধিক মাত্রায় অনুসিক্ত স্নেহপদার্থ উৎপন্ন হবে। পেটের ঘায়ের জন্য মাঠাতোলা দুধের চেয়ে মাঠা না তোলা দুধ বেশি উপকারী। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 6.2 নং তালিকাতে উল্লিখিত চিনাবাদম, নারকোল-শাস, সোয়াবিন থেকে যে উদ্ভিজ্জ দুধ হয় তা, মাঠা না তোলা দুধের বদলে পান করলে সুফল পাওয়া যায়। সিদ্ধ চিনাবাদাম চিবিয়ে খাবার সময় মাঠাতোলা দুধ পান করলেও ভালো ফল হয়।

5. জ্যাম ও জেলী সাধারণত উপকারী। এর মধ্যে 'পেকটিন' নামে এক বিশেষ ধরনের শ্বেতসার থাকে যার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও অন্যান্য তরল পদার্থ শুষে নেবার ক্ষমতা আছে।

6. এ ছাড়া অন্যান্য খাবারের মধ্যে পাউরুটি, হাতে গড়া রুটি, চটকানো কলা, সফেদা, সিদ্ধ সব্জী, কাঁচা শাক, মাংস ও মাছ সেদ্ধ করে চটকিয়ে খাওয়া চলে।

7. ঘা যখন খুব বেড়ে যায়, তখন খাবার জন্য দুধ, ক্রীম ও ডিম দিয়ে তরল আহার প্রস্তুতপ্রণালী ভেবে ঠিক করে নিতে হবে যাতে শক্ত ও জ্বালা সৃষ্টি করে এমন খাদ্য এড়ান যায়।

8. জ্বালা কমাবার জন্য অল্পশক্তির অম্ল-প্রতিরোধক অ্যালকালিস যেমন অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম-হাইড্রোক্সাইড, অথবা শোষণক্ষমতা-যুক্ত নির্যাস প্রভৃতি দিয়ে প্রস্তুত ঔষধের বড়ি বা ঘনীভূত (emulson) ঔষধ সেবন করা যেতে পারে। ঠিক খাবার আগে এ সব ঔষধের কোনো ফল হয় না, বরং খাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে যখন অম্লের পরিমাণ খুব বেশি হয় তখনই এ সব ঔষধ খেলে সুফল পাওয়া যায়।

উদরাময়

1. খাদ্য অথবা পানীয়ের সঙ্গে শরীরে যে জীবাণু প্রবেশ করে তা থেকে উদরাময় রোগ হয়। ঘনঘন পাতলা মলত্যাগ হওয়া এই

রোগের লক্ষণ। ব্যাকটেরিয়া, বেসিলি অথবা কৃমি থেকে এই রোগ ছড়ায়। সময়ে সময়ে মানসিক উত্তেজনা ও চাপে সামান্য উদরাময় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

2. যদি কোন ছোঁয়াচ লাগার জন্য উদরাময় হয় তা হলে জীবাণু-বিজ্ঞানীর সাহায্যে মল পরীক্ষা করিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করানো উচিত।

3. পৌষ্টিকতার দিক থেকে দেখলে উদরাময় সম্বন্ধে দুটি বিষয়ে মনে রাখতে হবে। এক হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রের পৌষ্টিক উপাদান গ্রহণের ক্ষমতা কমে যায়, কারণ খাবার এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় যে তা হজম করবার সময় পর্যন্ত থাকে না। ঘনঘন মলত্যাগের ফলে শরীর থেকে বেশ খানিকটা জল বেরিয়ে যায়।

4. এ সময়ে উচিত অত্যধিক ছিবড়া ও আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ না করা, জলপানের মাত্রা বাড়ানো ও যে সব মশলা হজমের অন্ত্রে প্রদাহ সৃষ্টি করে তার ব্যবহার কমিয়ে ফেলা।

5. দুধ, দই, ঘোল, মাংস, মাছ, স্নেহপদার্থ, তেল, চিনি, গুড়, সাবুদানা ও মধু প্রভৃতি পথ্য আঁশশূন্য। চাল, সুজি, ময়দা, ডাল, শাকপাতা, কুমড়ো, লাউ, শশা, কলা, আপেল ও পেঁপে প্রভৃতি খাওয়া যায়। উদরাময় রোগের প্রকোপ যদি বেশি হয় তা হলে রোগীকে তরল পথ্য যেমন দুধ, দই, ঘোল ও থকথকে পথ্য যেমন কাঞ্জি, পরিজ, ঝোল অথবা ফলের রস দেওয়া উচিত। এর উপকারিতা এই এর প্রত্যেকটি সহজপাচ্য ও শরীরে যে জলীয় অংশটুকু নষ্ট হয় তা এরা পূরণ করে।

6. মনে রাখতে হবে দু-একবার বেশি পরিমাণে খাওয়ার চেয়ে বারে বারে অল্প করে খেলে সুফল পাওয়া যায়।

7. এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে গরম জল ঠাণ্ডা করে পান করা উচিত।

8. খাবারে পাকা অথবা কাঁচা লঙ্কা, সরিষা ও আদা, যা খেলে জ্বালা করে তা ব্যবহার করা চলবে না। মেথির দানা, বিশেষ করে, কল-বেরোবার পর যখন তার তেতো ভাব কমে যায় (সপ্তম পরিচ্ছেদ দেখুন), এক চামচ দই অথবা দুধে মিশিয়ে খাওয়া যায়, এতে অন্ত্রে জল শুষে নিতে সাহায্য করে। এই রকম খাদ্যে লৌহের পরিমাণ বেশি আর উদরাময় রোগে লৌহ-খনিজপদার্থের বেশ দরকার হয়। এ-ছাড়া শাকপাতা সিদ্ধ চটকে খেলেও লৌহের অভাব পূর্ণ হয় কারণ এতে লৌহের ভাগ বেশি থাকে। শরীরের অতিরিক্ত জল শুষে নিতে ও জলকে কঠিন করতে ডালিমের খোসা পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে খেলে উপকার হয়।

ওজন-আধিক্য

1. কতটা দৈহিক ওজন অতি-ওজনের পর্যায়ে পড়ে, এটা ঠিক করে বলা শক্ত। তবে নানা উচ্চতার হৃষ্টপুষ্ট পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় নারী পুরুষের দেহের ওজনের পরিমাপ যে 9.1 তালিকাতে দেখানো হয়েছে তা থেকে ওজন কতটা হওয়া উচিত তার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। এক 168 সেন্টিমিটার মত মধ্যম উচ্চতার ব্যক্তির ওজন যদি উপরোক্ত তালিকায় দেওয়া সাধারণ ওজনের চেয়ে 12 কিলোগ্রাম বেশি হয় তাকে বেশ মোটা বলা চলে। আবার এই ওজনই একজন 155 সেন্টিমিটার সাধারণ উচ্চতার মহিলার পক্ষে 20 কিলোগ্রাম বেশি।

2. শরীর-চালনার জন্য যতটা ক্যালরি দরকার তার বেশি খেলে ওজন বাড়ে। এ ছাড়া অন্যান্য জটিল কারণ যেমন বংশগত ওজন-আধিক্য, মানসিক গঠন ও গ্রন্থীর অনিয়মিত কার্য ওজনবৃদ্ধির সহায়তা করে। পিতা মোটা হলে সন্তানদের মোটা হবার সম্ভাবনা বেশি আর খুশি ও আমুদে লোকদের মোটা হবার দিকে ঝোঁক থাকে। যদি থাইরয়েড ও পিটুইটরি গ্রন্থী সঠিক কাজ না করে তা হলে প্রধান

দেহকোষ বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়, ফলে দেহের ওজন সহজেই বেড়ে যায়। কিন্তু কতগুলি খাবারের দিকে মনোযোগ রাখলে ওজন বাড়তে পারে না। সত্যিকথা বলতে কি যারা উপযুক্ত পরিমাণে খেতে পায় না এমন সব গরীবদের মধ্যে কতজনই বা মোটা হয়

3. তাড়াতাড়ি ওজন কমাবার জন্য হঠাৎ আহারের পরিমাণ না কমিয়ে যদি মাসে 2-3 কিলোগ্রাম করে ওজন কমানো হয় তাতে সুফল পাওয়া যায়। এর মানে প্রতিদিন 500 ক্যালরি করে খাওয়া কমানো।

4. এর উত্তম উপায় হল চর্বি, স্নেহপদার্থ, চিনি প্রভৃতি ক্যালরি-বহুল উপকরণ যে-সব খাদ্যে অথবা রাঁধা খাবারে থাকে তার পরিমাণ কমাতে হবে ও সেই সঙ্গে প্রোটিনের মান বেশ উচ্চ রাখার জন্য চর্বি-বিহীন মাছ, মুর্গিশাবক ও মাঠাতোলা দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে হবে। অনেক রকমের সব্জী আছে যা খেলে পেট ভরে ও খাওয়ার তৃপ্তি হয় ও ভিটামিন ও খনিজপদার্থের অভাব হয় না অথচ তাতে ক্যালরির পরিমাণ কম থাকে, এ-রকম সব্জী সেঁকে বা সিদ্ধ করে সচরাচর খাওয়া চলে। ভেজে খেলে এ সব সব্জীর গুণ নষ্ট হয়ে যায়। অনেক প্রকারের শাকপাতা আছে যার মধ্যে নানাবিধ অতিসূক্ষ্ম পৌষ্টিক পদার্থ (micro-nutrients) থাকে কিন্তু ক্যালরি থাকে না। রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেলে নুন খাওয়া ছাড়তে হবে।

5. ব্যায়াম নিশ্চয়ই একটি ভালো অভ্যাস, কিন্তু বাস্তবিক এতে অল্পমাত্র শক্তি ব্যয় হয়। একটা কলা যতটা শক্তি জোগায় এক ঘণ্টা হাঁটলে ততটা দৈহিক শক্তি ব্যয় হয়, সুতরাং আহার-নিয়ন্ত্রণের জন্য কলাটা অনায়াসে বাদ দেওয়া চলে।

6. আহার-নিয়ন্ত্রণ করলে যে-সকল দৈহিক তন্তু নিঃশেষ হয়ে যায় তা জল অথবা তরল পদার্থে ভরে ওঠে, যার ফলে দেহের ওজন কমার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কয়েক মাস ধরে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ করে গেলে শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের জয় হয়।

তালিকা 9.1 ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্কদের উচ্চতা ও ওজনের সূচী

পুরুষ

উচ্চতা	বয়স বছর হিসাবে 20	35	50
সেণ্টিমিটার	ওজন (কেজি)		
148	42.7	47 6	50.9
153	45.4	50.4	53.5
158	48.6	53.5	56 3
163	51.1	56.3	59.4
168	54.0	60.1	63.7
173	58.1	64.0	68.3
178	61.9	68.5	72.4
183	66.0	73.3	77.8

স্ত্রীলোক

উচ্চতা	বয়স বছর হিসাবে 20	35	50
সেণ্টিমিটার	ওজন (কেজি)		
148	38.6	44.0	47.1
150	40.3	44.8	47.7
153	41.9	46.6	49.5
155	42.8	47.7	50.1
158	44.9	49.5	52.1
160	46.0	50 6	53.0
163	47.3	52.1	54.9
165	49.1	54.1	57.3
168	50 0	55.6	59.0

জ্বর থাকলে ও তার উপশম হবার পর পথ্য

1. জ্বর থাকলে ও তার উপশম হবার পরেও বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়, তাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা কম হয় ও ক্যালরির প্রয়োজনও কমে যায়। কিন্তু ক্ষয়গ্রস্ত দৈহিক তন্তুগুলিকে পুনর্বার সতেজ করে তুলতে অতিরিক্ত প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। এ সময়, এক কথায় বলা যায় অধিক প্রোটিন ও কম ক্যালরি-যুক্ত খাদ্য উপযুক্ত আহার। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে 60 গ্রাম প্রোটিন ও 1800 ক্যালরি প্রতিদিনের খাদ্যে থাকে।

2 প্রোটিন ঘনীভূত হলে ভালো হয়। এই প্রোটিন মাছ, মাংস, ডিম, দই, ঘোল, মাঠাতোলা দুধের গুঁড়ো, পনীর, ডাল প্রভৃতি থেকে সহজে পাওয়া যায়।

3. শরীরের পৌষ্টিক উপাদান সংগ্রহের ক্ষমতা হ্রাস পায় তাই এরকম খাবার গ্রহণ না করা সমীচীন। ভাজা ও বেশি আঁশযুক্ত খাবারের চেয়ে গাঁজানো খাবার, কল-বেরোনো ডালের তরকারি অনেক ভালো। পূর্বে উদরাময় রোগের আলোচনা করার সময় এ-সব খাবারের কথা বলা হয়েছে।

4. শস্যখাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে ও প্রোটিনের মাত্রা বাড়িয়ে যে মিশ্র খাদ্যের কথা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 6.7 তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রয়োজন মেটাবার সম্ভবপর উপায়। সিদ্ধ ও সেঁকা খাবারের তুলনায় ভাজা, অতিরিক্ত স্নেহপদার্থযুক্ত অথবা মিষ্ট খাবার কম খাওয়া বাঞ্ছনীয়।

5. প্রচুর জলীয় পদার্থ (জল, ঘোল, ডাবের জল, চা) খাওয়া উচিত, কিন্তু তাতে চিনি মেশানো চলবে না।

বার্ধক্যের পথ্য

বৃদ্ধবয়সে শারীরিক তৎপরতা কমার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের চাহিদা কমে আসে। 60 বছর বয়সের পর ক্যালরির প্রয়োজন এক-তৃতীয়াংশ

কমিয়ে ফেলা যায়। এ বয়সে জোর করে খাবার অভ্যাসের পরিবর্তন করা যায় না তবে অভ্যাস ঠিক রেখে খাদ্যের পরিমাণ কমানো চলে।

2. কম ওজন হাড়ে কম চাপ সৃষ্টি করে তাতে, পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কমে যায়, আর পড়ে গেলেও ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে।

3. বার্ধক্যে কয়েকটা দাঁত পড়ে যেতে পারে সে জন্য নরম খাবারের প্রয়োজন হয়। পরিপাকযন্ত্রের কার্যক্ষমতা কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়ায় কোষ্ঠকাঠিন্য সচরাচর হয়। স্নেহপদার্থ, হজম করার বিশেষ অসুবিধা হয়। মূত্রাশয় আর আগের মত ভালোভাবে কাজ করে না।

4. ভাত ও আটা যতটা সম্ভব নরম করে রাঁধতে হবে। যদি দেখা যায় পেটে গ্যাস হচ্ছে তবে ডাল খাওয়া কমাতে হবে। খাবারের মধ্যে কম আঁশযুক্ত খাবার (উদরাময় রোগের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে) বেছে নিয়ে তা মিহি করে পিষে নিতে হবে। ডিমও নরম করে রাঁধা খেতে হবে। নরম কোন ফল অথবা ফলের রস খাওয়া উচিত। সব্জী নরম রেখে রাঁধতে হবে ভাজা চলবে না। প্রায়ই দেখা যায় এ বয়সে মিষ্টি খাবার লোভ বাড়ে তবুও তা সংবরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

5. পরিমাণে কম ও বারে বেশি আহার করলে হজমের সুবিধা হবে। মধ্যাহ্নভোজনকে দিনের প্রধান আহার করতে হবে ও তারপর একটু বিশ্রামের ব্যবস্থাও করতে হবে। রাত্রের ভোজনপর্ব একেবারে উঠিয়ে দিয়ে সামান্য একটু জল খাবার ও গরম দুধ পান করার অভ্যাস করতে হবে।

দশম পরিচ্ছেদ

পচন, পরিচ্ছন্নতা ও রোগসংক্রমণ

খাদ্যে পুষ্টিকর উপাদান কম থাকলে আমাদের শরীরের নানাপ্রকার ক্ষতি হয় তা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। এই ক্ষতির পরিমাণ কখনো-কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যায় আবার কখনো কিছুটা কমও হয়। খাদ্য যদি তাজা না হয় অথবা কোনো প্রকারে দূষিত হয় তা হলে পৌষ্টিক উপাদানে ভরপুর হলেও সে খাদ্য ক্ষতি করে। কি ভাবে এটা রোধ করা যায় জানতে হলে আমাদের জানতে হবে খাদ্য কি প্রকারে দূষিত হয়। এ ভাবে অনুসন্ধান করতে করতে যে জল আমরা পান করি তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার উপরও নজর রাখতে হবে। এছাড়া মলমূত্র অপসারণ করা ও রান্নাঘরকে আবর্জনা মুক্ত করার দিকে সমানভাবে সচেতন হতে হবে।

খাদ্যের স্বাভাবিক পরিবর্তন

সকল প্রকার খাদ্যবস্তুরই পরিবর্তন ঘটে। যেমন কাঁচা ফল রাখতে রাখতে পেকে যায়, ডিম নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্যবস্তুর মধ্যে 'এনজাইম' থাকে যা জটিল রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়—প্রথমে কাঁচা জিনিসকে পাকায় ও পরে তাতে পচন ধরায়।

অনেকক্ষেত্রে আবার শুধু এনজাইমই পরিবর্তন ঘটায় তা নয়, অতি ক্ষুদ্র জীবকোষ অর্থাৎ 'মাইক্রো-অরগ্যানিজম'-এর দ্বারাও খাদ্যবস্তুর মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটে। এই অতি সূক্ষ্ম জীবকোষকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া), তাড়ি (ইস্ট) ও ছত্রক (মোল্ড)। এরা খাদ্যবস্তুর যে পরিবর্তন ঘটায় তা প্রয়োজনীয় অথবা অপ্রয়োজনীয় এই দুই প্রকারই হতে পারে। প্রথমে আমরা এদের উপকারিতা আলোচনা করবো। এ দেশের প্রায় প্রতি ঘরেই দুধে জীবাণুর সাহায্যে অম্লরস সৃষ্টি করে তাতে দই জমানো হয় এটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। ইডলি, দোসা ও খামন তৈরি করার জন্য চালগুঁড়ো ও ডালবাটাকে গাঁজিয়ে তোলা দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। খাদ্যে যে স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া থাকে তার সাহায্যে এই পরিবর্তন হয়। পাশ্চাত্য-দেশের মত পাউরুটি করতে হলে মাখা ময়দায় 'তাড়ি' মেশাতে হয়। এতে মাখা ময়দা গেঁজে ওঠে ও পাউরুটি সেঁকার সময় ফুলে বড়ো হয়ে ওঠে।

ছত্রক বা ছাতাপড়া আমাদের অপরিচিত নয়। সচরাচর ভিজে চামড়ার জুতোর উপর সবুজ বা হলদে রঙের ছত্রক হয়। খাদ্যবস্তুর উপর যে ছত্রক জন্মায় তা দেখতে বেশ বিশ্রী হলেও সবসময়ে ক্ষতিকর নয়। 'গরগনজোলা' (gorgonzola), 'স্টিলটন' (stilton) প্রভৃতি কয়েকপ্রকার পাশ্চাত্য দেশের পনীরে এই রকম পাঁশুটে সবুজ বা নীল রং-এর ছত্রক দেখা যায়। এই ছত্রক পনীরে একটি বিশেষ গন্ধের উপকরণ সৃষ্টি করে। একপ্রকার ছত্রকের দ্বারা কারখানায় জীবাণু-ধ্বংসকারী পেনিসিলিন তৈরি হয়। খুব যত্ন সহকারে এক নির্দিষ্ট আধারের উপর এই 'ছত্রক' জন্মানো হয় ও তা থেকে 'পেনিসিলিন' উৎপন্ন হলে তা সংগ্রহ করা হয়। ছত্রক একেবারে বিলোপ করা যায় না কারণ হাওয়া ও মাটিতে সর্বত্রই এই ছত্রক থাকে। উপকারী ছত্রককে নানাবিধ হিতকর কাজে লাগানো যায় ও অপকারী ছত্রকেরও বৃদ্ধিরোধ করা যায়।

খাদ্যবস্তুতে এনজাইম, ব্যাকটেরিয়া, তাড়ি ও ছত্রকের ক্রিয়া কি ভাবে আয়ত্তাধীন রাখা যায়? কার্যোপযোগী থাকতে হলে এদের সকলেরই বায়ু, আর্দ্রতা ও নির্দিষ্ট তাপমাত্রার (সাধারণত শরীরের তাপমাত্রা মানে 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) প্রয়োজন হয়। এগুলির মধ্যে একটি বা একাধিক বস্তুর অভাব ঘটালে এদের বৃদ্ধি রোধ করা যায়। সমস্ত সূক্ষ্ম-জীবাণু গরম করলে নির্মূল হয়। সুতরাং খাদ্যবস্তু যদি অধিক উত্তাপে সিদ্ধ করা হয় অথবা কড়া বা হাল্কা করে ভাজা হয় বা আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয় অথবা সেঁকা হয় তা হলে এগুলি ক্ষতিকর জীবাণুমুক্ত হয়। দুধ অবশ্য 'প্যাসটারিজেসন' (pasteurisation) করে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এই ভাবে জীবাণুমুক্ত করার পরে খাদ্য-বস্তু যদি বায়ুশূন্য কাঁচের বোতল বা টিনের কৌটায় রাখা হয় তা হলে অনেকদিন পর্যন্ত এ-সব সংরক্ষিত থাকে। খাদ্যবস্তুতে কিছুটা জলীয় অংশ থাকলে তবে সূক্ষ্ম-জীবাণুরা সক্রিয় থাকতে পারে। রৌদ্রে শুকিয়ে যদি খাদ্যের জলীয় অংশ অনেকটা কমিয়ে আনা যায় তাতে এনজাইম ও সূক্ষ্ম-জীবাণু বৃদ্ধি পেতে পারে না। ভাঁড়ারে তুলে রাখার আগে সুজি যদি সামান্য সেঁকে নেওয়া হয় তাতে উপরোক্ত সুফল পাওয়া যায়। কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যও এদের অবাঞ্ছিত বৃদ্ধিরোধ করতে পারে। কয়েকপ্রকার খাদ্যবস্তু যাতে নষ্ট হয়ে না যায় ও অনেকদিন থাকে সেই জন্য তাতে নুন, ক্ষারজাতীয় দ্রব্য যেমন ভিনিগার, তেল ও কয়েকপ্রকার মশলা (নোনা জিনিস অথবা আচার যেভাবে করা হয়), চিনির রস (মোরব্বা করতে অথবা লজেন্স প্রভৃতিতে লাগে) প্রভৃতি মেশানো হয়। খাদ্যবস্তু-সংরক্ষণের ইহা আর একটি উপায়।

এনজাইম ও সূক্ষ্ম-জীবাণুসমষ্টি গরমে মরে যায় আর ঠাণ্ডায় ওরা নির্জীব হয়ে পড়ে অথবা জমে যায়। রেফ্রিজারেটারে রাখলে ওদের এই অবস্থা হয় যার ফলে রেফ্রিজারেটারে ফল, সব্জী ও দুধ বেশ কয়েকদিন

রাখলে তা নষ্ট হয় না। কিন্তু মাছ ও মাংস সংরক্ষণের জন্য অত্যধিক ঠাণ্ডা, বরফ-জমানোর জন্য যতটা ঠাণ্ডা দরকার তার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডার প্রয়োজন হয়। যে সব খাদ্যবস্তুকে নষ্ট হবার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কৃত্রিম ঠাণ্ডায় রাখা হয় তাদের সেই শীতল তাপমাত্রা থেকে সরিয়ে ঘরের তাপমাত্রায় রাখলে আবার তাদের পচন ও পরিবর্তন সুরু হয়।

খাদ্য হতে অপকার

কয়েকটি সূক্ষ্ম-জীবাণুসমষ্টি খাদ্যে অপকারক উপাদান সৃষ্টি করে যা থেকে রোগের উৎপত্তি হয়। দুই প্রকারের ব্যাকটেরিয়া এই রোগ-সৃষ্টির সহায়তা করে। 'স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়স' (staphylococcus aureus)এর অন্যতম। সচরাচর সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির গায়ের চামড়ায়, চুলে, নাকে ও গলায় এই জীবাণু দেখা যায়। হাতের ছোঁয়াচ, ওঠা চুল, গয়ার বা থুথু থেকে যদি খাবারে এই জীবাণু-সমষ্টি পৌঁছায়, সেখানে তারা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর 'টক্সিন' তৈরি করে। টক্সিনযুক্ত খাবার খেলে প্রচণ্ড বমি ও উদরাময় হয়। স্বাস্থ্যবান লোকেরা এ সব উপসর্গ অল্পসময়ের মধ্যে কাটিয়ে উঠতে প.রে কিন্তু বৃদ্ধ ও শিশুদের পক্ষে, সহজেই কল্পনা করা যায় যে, এই টক্সিন প্রকৃত বিপজ্জনক হয়।

দ্বিতীয় প্রব.ার ব্যাকটিরিয়া-জাত 'টক্সিন' এত মারাত্মক যে এতে প্রায় মৃত্যু ঘটে। এই অবস্থাকে 'বটুলিজম' (botulism) বলা হয়। বাড়িতে সহজ পদ্ধতিতে খাদ্য টিনের কৌটায় সংরক্ষণ সব সময়ে ক্রটি-হীন হয় না এবং এই খাদ্য থেকে বটুলিজমের উৎপত্তি হয়। সুতরাং এই ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করে নিতে বাড়িতে তৈরি ও টিনে সংরক্ষিত শাকসব্জী খাবার আগে মিনিট দশ ভালোভাবে ফুটিয়ে নেওয়া উচিত।

খাদ্যবস্তুর উপর জন্মায় এরকম কয়েকপ্রকার ছত্রক খুব ক্ষতিকর। এদের মধ্যে "অ্যাসপারগিলাস ফ্লেভাস" (aspergillus flavus) যা ভিজে শস্যখাদ্য, তৈলবীজ প্রভৃতি ঐ জাতীয় পদার্থের উপর জন্মায় এবং তা থেকে 'টক্সিন'-এর সৃষ্টি হয় যা খেলে অল্পবয়সী জন্তু-জানোয়ারের মৃত্যু ঘটে ও মানুষের যকৃতের ক্ষতি করে ও হয়তো ক্যানসার রোগের সূত্রপাত করে। সে কারণে অপুষ্ট বিবর্ণ বা ছাতাপড়া চিনাবাদাম, কাজুবাদাম কিংবা বাদাম না খাওয়া উচিত।

সংক্রামক রোগের জীবাণু-বহনকারী খাদ্যবস্তু ও পানীয় জল

যে সব রোগের কথা বলা হল তার মধ্যে ছোঁয়াচে রোগের পার্থক্য আছে। দূষিত খাদ্যজনিত রোগ কেবলমাত্র যে খায় সে একলা ভোগে, কিন্তু ছোঁয়াচে রোগ একজনের থেকে অন্য দশজনের হয় সুতরাং সেটা অধিক মারাত্মক। সংক্রামক রোগ যেমন টাইফয়েড, আমাশা, কলেরা, যক্ষ্মা নানা প্রকারের সূক্ষ্ম জীবাণুসমষ্টির (যেমন 'ব্যাকটেরিয়া', 'বেসিলি' ও 'ভাইরাস') মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এককথায় এ গুলিকে জীবাণু বলে আর খাদ্যবস্তু, পানীয় জল ও দুধের মাধ্যমে এরা বিস্তার লাভ করে। এ ছাড়া মলমূত্রও জীবাণু বহন করে। আঁস্তাকুড় বা রান্নাঘরের আবর্জনা যা আমরা স্তূপীকৃত করে রাখি তাতে আরশোলা, ইঁদুর, মাছি ও অন্যান্য পোকামাকড় জন্মায় ও এই সব নোংরা খেয়ে তারা সংক্রামক রোগ ছড়ায়। এ সব আবর্জনা দূর করার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য।

খাদ্যবস্তুতে ছোঁয়াচ নিবারণ করা

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে নানাপ্রকারে রান্না করে অথবা নানা প্রণালীতে খাদ্যকে শুকিয়ে টিনের কৌটায় বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে অথবা আচার ও মোরব্বা করে খাদ্যের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন রোধ করা বা বন্ধ করা যায়। সেইসঙ্গে কোন অপকারী জীবাণু যদি কোনো-

ভাবে খাদ্যবস্তুর সংস্পর্শে আসে তাও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। রান্নার এই সব প্রণালী সকলেই ভালোভাবে জানেন সুতরাং এর উপকারিতার বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

দুধ সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলা প্রয়োজন, কারণ এটা সাধারণের পানীয় আর দুধ যেমন সহজেই নষ্ট হয়ে যায় তেমনি সহজেই রোগের ছোঁয়াচ লাগে। দুগ্ধবতী পশুটি (গরু অথবা মহিষ) যদি রুগ্ন হয় সূক্ষ্ম জীবাণুসমষ্টি তার দুধে মিশে যায়, অথবা যদি এদের বাঁট বিষিয়ে থাকে কিংবা যে জল দিয়ে বাঁট ধোয়ানো হয় ও নোংরা বা দূষিত হয় তা থেকে সূক্ষ্ম জীবাণুসমষ্টি দুধে এসে যায়। এ ছাড়া গোয়ালার হাত ও যে পাত্রে দুধ দোহা হয় তা যদি অপরিষ্কার থাকে অথবা দুধে অপরিস্রুত জল মেশানো হয় তাতেও দুধ দূষিত হয়। সাধারণত বাড়ীতে দুধকে ভালোভাবে জ্বাল দিয়ে নেওয়া হয়, এটি একটি উৎকৃষ্ট প্রথা। এর দ্বারা দুধ জীবাণুশূন্য হয় ও তা বেশি সময় রাখাও চলে। 'প্যাস্ট-রাইজড' দুধ এমনিতে জীবাণুশূন্য হওয়া উচিত কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে নানাবিধ অনিশ্চয়তা থাকার জন্য এই দুধ একবার জ্বাল দিয়ে নিলে ভালো হয়। শিশুদের জন্য যদি জল মিশিয়ে দুধকে পাতলা করতে হয় তা হলে জল মেশাবার পর সেই দুধ একবার ফুটিয়ে নেওয়া উচিত। মাখনতোলা দুধের গুঁড়ো থেকে দুধ প্রস্তুত করবার সময় তাতে প্রথমত ফোটানো জল মিশিয়ে আবার দুধকে ফুটিয়ে নেওয়া ভালো। দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন পনীর ও ছানা তৈরি করার সময় ফোটানো দুধ ব্যবহার করা হলেও এতে জীবাণু থেকে যায় এবং বিক্রির জন্য যখন খুলে রাখা হয় এতে টক্সিন জন্মায়।

জল

কলের জল জীবাণুমুক্ত নিরাপদ করার জন্য যথোপযুক্ত উপায়ে তাকে পরিস্রুত করা হয় কিন্তু ভারতবর্ষে সাতজনের মধ্যে মাত্র একজন

এই জল পায়। আর বাকি সকলে নদী, খাল, কুয়ো, দীঘি বা পুকুর থেকে যে রকম জল পায় তাই ব্যবহার করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সব জলাশয়ে লোকেরা স্নান করে (তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার রুগ্ন), কাপড় কাচে, রোগীর ব্যবহার করা বাসন ধোয়, এর পাড়ে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করে এসে এই জলেই শৌচাদি সারে ও গরু-মহিষাদি স্নান করায়। নিশ্চয় করে বলা যায় যে এ জল দূষিত ও এতে টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া ও কলেরার জীবাণু থাকে। জনস্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য সারা দেশে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের আশু প্রয়োজন, বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে অন্তত সিমেন্টের দেওয়াল দেওয়া গভীর নলকূপ চলতে পারে।

বাড়িতে জীবাণুমুক্ত জল পাবার উপায় তা হল ভালো করে পানীয় জল ফুটিয়ে নেওয়া। যে জল দিয়ে স্যালাড অথবা কাঁচা খাবার-সব্জী ধোওয়া হয়, যে জল দুধ অথবা ঘোলে মেশানো হয় ও যে জল দিয়ে চাটনি তৈরি হয়. ব্যবহারের আগে তা ফুটিয়ে নেওয়া দরকার। তা না পারলে জলে হয় নুন, না হয় দু-এক টুকরা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অথবা একটু ফটকিরি মিশিয়ে নিলেও চলে, এরা প্রত্যেকটি জীবাণুনাশক।

জল পরিস্রুত করার আরও একটি উপায় হল জল ছেঁকে নেওয়া। দুটো বালিমাটির পাত্র একটার উপর আর একটা রাখতে হয়। উপরের পাত্রটার প্রথমে এক স্তর কাঠকয়লার টুকরো তার উপর এক স্তর বালি রেখে জল ঢেলে পাত্রটি পূর্ণ করে দিতে হবে। বালি, কাঠ-কয়লার স্তর দিয়ে চুঁইয়ে একটু-একটু করে নিচের পাত্রে যে জল জমা হবে তা পরিস্রুত ও তা ব্যবহারযোগ্য। তামার পাত্রে জল রেখে তা যদি রৌদ্রে রাখা যায় তাতেও জল জীবাণুমুক্ত হয়।

শহরের লোকেরা যদিও পরিস্রুত জল পায় কিন্তু হজমের গণ্ডগোল দূর করার জন্য তাদেরও জল নিয়ম করে ফুটিয়ে খাওয়া উচিত, আর বাড়ির বাইরে তাদের জলের প্রয়োজন হলে জলের বদলে বোতলের সোডা লিম-নেড, চা অথবা কফি প্রভৃতি নিরাপদ পানীয় গ্রহণের অভ্যাস করতে হবে।

মলমূত্র

মলমূত্র মিশে জল অনেক ক্ষেত্রে দূষিত হয়। আমাশা কিংবা কৃমি রোগীর মলে, আমাশার জীবাণু অথবা কৃমি থাকে। জলাশয়ের কাছে যদি এরা মলত্যাগ করে, বর্ষার জলের সঙ্গে অথবা মানুষ ও পশুর পায়ে-পায়ে তা জলাশয়ের জলে মিশে যায়। সময় সময় জলের জীবাণু খাদ্যবস্তুকেও দূষিত করে। শৌচকার্যের পর যদি ভাল করে হাত ধোয়া না হয় তা হলে নখের মধ্যে ময়লা লেগে থাকে এবং তা থেকে খাদ্য দূষিত হয়। এ ছাড়া মাছি, ইঁদুর ও পাখির দ্বারাও খাদ্য দূষিত হয়। মাটি দিয়ে বাসন মাজলে তাতে রোগের জীবাণু গিয়ে লাগে।

শহরে ময়লা জল-নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকায় জল প্রভৃতি নিষ্কাশনের কোন সমস্যাই হয় না। শহরের বাইরে বিশেষ করে স্কুলে ভালো পায়খানা তৈরি করানো অথবা সহজ উপায়ে গভীর কুয়ো-পায়খানা করে লওয়া দরকার। এ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে ছেলেমেয়েদের শৌচ করার পর সাবান ও জল দিয়ে উত্তমরূপে হাত ধোয়ার উপকারিতা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। অল্প বয়স থেকেই মায়েদের ছেলেমেয়েদের ভালো করে হাত-পা ধোয়ার অভ্যাস করানো কর্তব্য। স্বাস্থ্যসম্মত কোন ব্যবস্থা না থাকায় ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলেই খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করা হয়। উপায়ান্তর না থাকলে যে জলাশয় থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা হয় সেখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে, অথবা বসতি ছাড়িয়ে নদীর নিম্নপ্রবাহে মলত্যাগ করা চলতে পারে। পরিত্যক্ত জল বালি দিয়ে ঢেকে দিলে রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা কম থাকে ; কুকুর ও বিড়াল স্বভাবতই এ রকম করে।

গোবর-গ্যাস-প্লান্ট-এ গোবর থেকে যে গ্যাস প্রস্তুত হয় তা বাড়ীর রান্না ও আলো জ্বালার কাজে লাগে, অবশিষ্ট যা পড়ে থাকে তা গন্ধহীন সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। গোবরের বদলে মানুষের মল ব্যবহার করা চলে। কেবলমাত্র গ্যাস-প্লান্টের চারপাশ ঘিরে যদি আড়াল

করে দেওয়া হয়। তাতে জল সোজা প্লাণ্টের মধ্যে গিয়ে পড়বে। এতে আবর্জনা নিষ্কাশণের সুব্যবস্থা হবে, পরিচ্ছন্নতা বাড়বে ও গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

আবর্জনা

সব্জী ও ফলের খোসা, খাদ্যের অবশিষ্ট আর রান্নাঘরের ফেলে দেওয়া নোংরায় মাছি, আরশোলা ও ইঁদুর জন্মায় ও এই সব খায়। এরা সকলেই রোগের জীবাণু বহন করে। মাছি নোংরায় জন্মায় ও তাদের গায়ে ও পায়ে দূষিত জীবাণু লেগে থাকে, তারপর তারা উড়ে যে খাদ্য-দ্রব্যের উপরে বসে তাতে সেই দূষিত জীবাণু লেগে যায়। রান্নার বাসন, মশলা-পেষার শিল-নোড়া এসবের উপরেই আরশোলা ঘোরা-ফেরা করে ও আমাশা ও উদরাময়ের জীবাণু ছড়িয়ে যায়। ইঁদুর শুধু যে খাবার খেয়ে নষ্ট করে তা নয় তাদের শরীরের দূষিত জীবাণু মল-মূত্রের সঙ্গে ও পায়ে পায়ে খাদ্যবস্তুতে সংক্রমিত হয়।

শহরে বাড়ীর আবর্জনা ঢাকা দেওয়া পাত্রে রেখে মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা-সংগ্রহ ব্যবস্থায় প্রতিদিন ফেলে দেওয়া উচিত। গ্রামাঞ্চলে পাতকুড়ানো খাবার গবাদি পশুদের অথবা মুর্গিকে খাইয়ে দেওয়া যায় অথবা গভীর গর্তে পুঁতে ফেলাও চলে।

পরিচ্ছন্ন থাকা

সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা, শৌচাদির অভ্যাসের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। যার শরীরে আগে থেকে জীবাণুর ছোঁয়াচ ছিল এমন লোকের সঙ্গে টাকা-পয়সার লেনদেন করলে, তার ধরা সিঁড়ি, বাস অথবা ট্রেনের হাতল ধরলে, কিবা তার ব্যবহার করা চেয়ার টেবিল, কাপ ও চামচ ব্যবহার করলে আমাদের হাতে জীবাণু সংক্রামিত হওয়া বিচিত্র নয়, এবং খাবার তৈরি করার ও খাওয়ার সময় হাতে সে জীবাণু লেগে থাকবে তাতে

সন্দেহ কোথায়। সুতরাং রান্নার আগে ও খেতে বসবার আগে সাবধানতার জন্য হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া বিচক্ষণতার লক্ষণ। কাশবার অথবা হাঁচবার সময় আমাদের মুখ নাক ঢেকে রাখা উচিত, কারণ এই সময়ে কিছু জীবাণু বেরিয়ে আসে,সে সময় যদি অন্যের সঙ্গে বসে খাওয়া চলতে থাকে তার খাবারে এই জীবাণু মিশে যাবে। পায়েও ময়লা লাগতে পারে সেজন্য কোনো না কোনোরকম জুতা পরা দরকার। প্রত্যহ স্নান করা, প্রতিদিন সকালে জামাকাপড় বদলানো, রৌদ্রে জামা কাপড় শুকিয়ে নেওয়া ভালো অভ্যাসের অঙ্গ, এতে সোজাসুজি ময়লার হাত হতে রক্ষা পাওয়া যায় ও সেই সঙ্গে খাদ্যবস্তুকেও জীবাণুমুক্ত রাখা যায়। যে-সব জায়গায় অনেক লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়, যেমন রেস্তোরাঁ, হোটেল, স্কুল ও কলেজের ক্যান্টিন অথবা বিবাহ-ভোজে, এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাস মেনে চলা খুবই দরকার।

রান্নার বাসনপত্র

ঝকঝকে রান্নাঘর, তাতে সারিসারি চকচকে থালা, বাটি, কড়াই রাখা আছে এ দৃশ্য ভারতবর্ষে প্রায়ই চোখে পড়ে। কিন্তু ঝকঝকে বাসনপত্র অনেক সময় ভ্রান্তি ঘটায়। চকচকে ঝকঝকে করতে বাসন-পত্র মাটি দিয়ে মাজতে হয় আর সেই মাটিতে হয়তো মানুষ অথবা পশুর ছোঁয়াচে জীবাণু থাকে। বাসনমাজার জন্য পরিষ্কার মাটি সংগ্রহ করে বাক্সে কিংবা একটি পাত্রে রেখে দিলে ভালো হয়। কাঠের ছাই, ইটের গুঁড়ো, কাঠকয়লার গুঁড়ো প্রভৃতি পরিষ্কার করার জিনিস ভালো ও নিরাপদ। ভালো করে বাসন মাজার পর যদি বাসন ময়লা কাপড় দিয়ে পোঁছা হয় তো ভালো ফল সব নষ্ট হয়ে যায়। আর একপ্রকার সহজসাধ্য উপায়ে বাসনকে জীবাণুমুক্ত করতে পারা যায় যদি ধোয়ার পর সে গুলিকে রৌদ্রে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এটা আমরা সকলেই করতে পারি।

সুষম খাদ্যের অর্থ
আমাদের পরিপাক ক্রিয়া
খাদ্য সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি নিষেধ
গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়ের ও শিশুর খাদ্য
খাদ্যের পূর্ণ উপযোগ
বিশেষ খাদ্য
দুষিত খাদ্য পরিচ্ছন্নতা ও রোগ সংক্রমণ
খাদ্য সংক্রান্ত এমনিই বহু কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় নিয়ে ডাঃ অচ্চয়া এই বইটিতে আলোচনা করেছেন। খাদ্যবস্তুর বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের।

যুক্তরাজ্য, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ডাঃ অচ্চয়া "রিজিওনাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরী" নামে হায়দ্রাবাদে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। তিনি 1971 সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত, বম্বের "প্রোটিন ফুড্ নিউট্রিসন ডেভেলপমেন্ট্ অ্যাসোসিয়েসন্ অব্ ইণ্ডিয়া"-র একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

Rs. 7.00

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া